

বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৭০

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
আবুল বারক আলভী
ছেপেছেন :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

SRABANE ASWINE
By Burhanuddin Khan Jahangir
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj
Dacca—1
Price Taka 5·0

সূচীপত্র

শ্রাবণে আশ্বিনে

সুন্দরের তৃষ্ণা

রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা ভাষার মহত্তম কবি, যাঁর মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের সন্নিপাত ঘটেছিলো, তিনি অবিরল কাজ ও জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি তৈরী করেছেন। ঐ সংস্কৃতি বিদগ্ধ, রুচিতে বৈশ্বিক, জীবনচর্যায় নন্দনতাত্ত্বিক। বৈদগ্ধ্য, বৈশ্বিকতা, নন্দনতাত্ত্বিকতার মান উৎসারিত হয়েছে তাঁর কাজ থেকে। আর কাজ তাঁর জন্য ছিল জীবন-রচনা, সেই জীবনরচনাকে তিনি বৈদগ্ধ্যে বৈশ্বিকতায় নন্দনতাত্ত্বিকতায় উন্মীলিত করেছেন, যেন বিচ্ছিন্ন শিল্প সংহত করেছেন জীবনযাপনে। এভাবেই শিল্প স্রোতের মতো ছড়িয়েছে সারাদেশে, পলিমাটির মতো উর্বর করেছে মানসজীবন, রুচিকে অনিবার্য করে তুলেছে, নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন জীবনে এসে গেছে। তাঁর আগে জীবনযাপনে শিল্প অঙ্গাঙ্গী ছিল না, জীবনচর্যায় নন্দনতত্ত্ব ছিল না। কর্ষিত দিকের বদলে ছিল ফলিত দিক, ফলে সংস্কৃতি ও ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় তৈরী হয়নি, সংস্কৃতি রূপ লাভ করেছে গ্রামের পালাপার্বণে, শহরের বাবুবিলাসে। ঐ দ্বিখণ্ডিত সাংস্কৃতিক পরিবেশে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের জীবনে সংস্কৃতির কর্ষিত দিকটির বিকাশ ঘটেনি। বিদ্যাসাগর? মাইকেল? মীর মশাররফ হোসেন? তাঁদের জীবনচর্যায় কি বৈদগ্ধ্য, বৈশ্বিকতা, নন্দনতাত্ত্বিকতার সম্মিলন ঘটেছে? বিদ্যাসাগর প্রাদেশিক, মাইকেল খণ্ডিত, মীর মশাররফ হোসেন গ্রামীণ; সেজন্য তাঁদের নিজস্বতা, মৌলিকতা সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসারিত হয়েছে, জীবনযাপনে রুচি গড়েনি। জীবনচর্যায় নন্দনতত্ত্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথে প্রথম, তিনি সচেতনভাবে রুচি ব্যবহার করেছেন শিল্পে ও জীবনে, বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ ঘটিয়েছেন বিশ্বের।

কেন তাঁরা পারেন নি? আর কেনই বা রবীন্দ্রনাথ পেরেছেন? জবাব নেহাৎই ব্যক্তিক ক্ষমতা ও প্রতিভার জন্য নয়। কারণ বাংলা সংস্কৃতি তার

নিজের ধাঁচে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আত্মস্থ করেছে। আসলে ঐ আত্মস্থকরণের অভিঘাত পড়েছে সাহিত্যে; ভাস্কর্যে স্থাপত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে নয়। ঐ আত্মস্থকরণ সাহিত্যের ঐতিহ্যের ধাঁচেই হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে প্রেরণার চেয়ে অনুশীলনের, আবেগের চেয়ে বুদ্ধির, বৈচিত্র্যের চেয়ে বৈদগ্ধ্যের কদর বেশী ছিলো। ভারতচন্দ্রের মতো শিক্ষিত, ঐতিহ্য সচেতন, কুশলী ও প্রাপ্তবয়স্ক কবি বাংলা সাহিত্যে বিরল। ঐ ঐতিহ্য ও রুচির বিরুদ্ধে সাহিত্যের নিয়মেই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের বিপরীত রামপ্রসাদ, তাঁর গান হৃদয়ের নিঃসরণ, সারল্যই তাঁর শিল্পের অভিজ্ঞান। ঐ দুজন কবি সাহিত্যের দুই বিরোধী আদর্শের প্রতিনিধি এবং ঐ দুই বিরোধী আদর্শের দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতকের অন্তিমে অমোঘ হয়ে দেখা দিয়েছিল। ঐ দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করল ইংরেজী সাহিত্যের অভিঘাত, ঐ নিরীক্ষার পটেই রোমাণ্টিক আন্দোলনের বাংলাসাহিত্যের সংস্করণ দেখা দিলো, এবং বাংলা সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত রোমাণ্টিক আদর্শই জয়ী হলো, প্রবল বিজয়ীর বেশে দেখা দিলো রবীন্দ্রনাথের রচনায়। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে বাংলাসাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো, ফের সেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে উনিশ শতকে। সেজন্য বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের ভাষা ধীরগামী ও সংস্কৃতবহুল, তাঁদের অবলম্বন হচ্ছে সংস্কৃত সাহিত্য। বিদ্যাসাগর মহৎ য়ুরোপীয়, তাঁর মধ্যে লোকসংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। তিনি নিজের জগৎ গড়ে তুলেছেন সংস্কৃত ঘেঁষা ভাষায়, কারণ সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাস, বিশৃঙ্খল প্রাদেশিকতা থেকে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্ব। সমসাময়িক জীবনের বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা থেকে বাঁচার পথ তিনি তৈরী করেছেন ভিন্নভাবে। লোকসংস্কৃতির মানবিকতা তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে মহত্ব এনেছে, অন্যপক্ষে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্ব তাঁর মানসিকতায় সম্ভ্রমবোধ সঞ্চারিত করেছে। আত্মরক্ষার ঐ পথ মাইকেলেও অনুসৃত।

মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্যের ঐ অভিঘাত বিশ্লেষণযোগ্য। আসলে, নবাবী আমলেও, বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান ছিল দরিদ্র, উৎপীড়িত, বঞ্চিত। দশম শতক থেকেই বাংলাদেশের খাঁটি বাঙালীরা বহিরাগত শাসকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। বহিরাগত ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ আর বৈদ্যের দল বাংলাদেশে যে চেপে বসেছিলো আদিশূর ও বল্লাল সেনের গল্প তার ইঙ্গিতবহ। পরবর্তী পাঠান ও মোঘল শাসকেরাও বহিরাগত। নবাবী আমলেও শাসক ছিলো বহিরাগত মুসলমান ও বর্ণ হিন্দু। আসলে বাংলাদেশে অধিকাংশ বাঙালী অত্যাচারিত

ছিলো, সেজন্য সমস্যাটা ধর্মের নয়, সমস্যাটা বরং বাঙালী ও অবাঙালীর। ঐ কারণেই নবাবী আমল দেশজ মুসলমানের স্বর্ণযুগ নয়। সেকালেও লেখাপড়া, হিসেব রাখা, সাহিত্য রচনা প্রভৃতি কর্ম প্রধানত বর্ণহিন্দুরা করেছে। বাঙালী মুসলমান অভিমান কিংবা অহঙ্কার করে ইংরেজী শেখেনি, তা নয়। ইংরেজ-পূর্ব যুগে যে-গুটিকয় মুসলমান পরিবার বাংলাদেশে ক্ষমতাশালী ছিলো তারা ইংরেজশাসনের পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে। মুর্শিদাবাদ কিংবা ঢাকার নবাবেরা ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের খেতাব, ইংরেজের চালচলন, স্কচহুইস্কির মূল্য অগ্রগণ্য শ্রেণীর প্রবণতা অনুযায়ী গ্রহণ করেছে; সেই সঙ্গে ঐ সব পরিবারেরা বাংলা দেশের ফরাজী, মোহাম্মদী, আহলে হাদীস আন্দোলন থেকে নিজেদের সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ঐ জন্য মীর মশার্‌রফ হোসেনের সাংস্কৃতিক রুচি সামাজিক কারণেই গ্রামীণ, ঢাকার নবাব কিংবা টাঙ্গাইলের গজনবী পরিবারের মতো বিশাল বাঙালী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অন্যপক্ষে ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের দরুন ঐ গ্রামীণ রুচির মাধ্যম সংস্কৃত বহুল বাংলাই।

রবীন্দ্রনাথে ঐ সব বিপরীতের সীমাবদ্ধ অর্থে একটা সমন্বয় ঘটেছে। তিনি সংস্কৃত বহুল বাংলাকে মুখের ভাষার ছেঁকে তুলেছেন এবং আঙ্গিক ও মেজাজ ব্যবহার করে মুখের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথের মুখের ভাষায় পরিণত করেছেন। এভাবেই ভাষাক্ষেত্রে এসেছে ব্যক্তিতা এবং ব্যক্তিতা অবলম্বন করে রুচি। ঐ রুচি তিনি প্রবিষ্ট করিয়েছেন বাস্তবে ও কল্পনায়, ঐ বাস্তব ও কল্পনা তিনি শোধন করেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা দিয়ে, ঐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা তিনি ধার করেছেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে, এ পথেই দেখা দিয়েছে তাঁর বৈশ্বিক-বোধ, যে-বোধের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিতার মূল্য। ঐ ব্যক্তিতার মূল্য তিনি সযত্নে অনুশীলন করেছেন জীবনচর্যায়, যে-চর্যা থেকে উৎসারিত হয়েছে নন্দনতত্ত্ব, যে-নন্দনতত্ত্ব সুন্দরের জন্য তৃষিত, স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ। ঐ নন্দনতত্ত্বে রোমাণ্টিক ভাবালুতা নেই, গ্রাম্য আলপনা নেই; আছে ঋজুতা, কঠিনতা, শুদ্ধতা, হিমালয়ের চুড়োর আবহাওয়া। তিনি নানা শিল্প ও জীবনযাপনে সংস্কৃতি কর্ষিত করেছেন, ঐ কর্ষণ বাঙালীর নোংরা, ছিন্নভিন্ন, কিম্ভূতকিমাকার পরিস্থিতিতে সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার করে তোলে, যেন বর্তমানের অপরিসর, অস্বচ্ছন্দ, অসচ্ছল সমাজে পরিচ্ছন্ন জীবনের সার্বিকতা আসে তাঁর সাহিত্য থেকে, তাঁর নানা শিল্পে আছে বিক্ষুব্ধ, বিচলিত চেতনার উপযোগী শান্তি আর আনন্দ। বাঙালী সংস্কৃতির ফলিত ফ্রেমের বিপরীতে তিনিই প্রথম

কষিত ফ্রেম তুলে ধরেছেন, ঐ কষিত ফ্রেমের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন জীবন যাপনের রুচিবোধ, বুঝি বাঙালীর সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন উদাহরণ তিনি। এভাবেই তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা, লোক-সংস্কৃতির মানবিক আবেগ, অভিজাত শ্রেণীর সম্ভ্রমবোধ ; ঐ সবকিছুকে তিনি নিজের নিয়মে সমীকরণ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাঙ্গালপনা, লোকসংস্কৃতির গ্রাম্যতা, অভিজাত শ্রেণীর আখড়াইচর্চা থেকে সংস্কৃতিকে ফের মুক্তি দিয়েছেন। (মুসলমান অন্দরমহলে ঐ আখড়াইচর্চার উজ্জ্বল নজির গাজী মিঁয়ার বস্তানীর বেগম ঠাকুরাণী চরিত্রটি।) উপকরণ ও চিত্তমার্জনার মাধ্যমে তিনি সংস্কৃতি রচনা করেছেন, অন্যপক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপকরণ সংস্কৃতি রচনার অংশভাক করে তুলেছেন। সেজন্য তিনিই সংস্কৃতি চর্চার প্রথম কষিত উদাহরণ।

রবীন্দ্রনাথের ঐ শক্তি এসেছে তাঁর শিল্পক্ষমতার সঙ্গে তাঁর মানসের একাত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মানস পটভূমি গড়ে উঠেছে পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক অন্বয় থেকে। বনেদী বাঙালী পরিবারের পরিবেশ, সরঞ্জাম ও মেজাজ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক ধুরপথে এনেছেন ; সেই পরিবেশ, সরঞ্জাম ও মেজাজ তাঁর বাক্যের ছন্দে, শব্দের ব্যবহারে, পদের প্রসাদে ছাপ রেখেছে ; তাঁর সাহিত্যিক কল্পনা, বিষয়, মন সমাজের বিভেদের স্তরগুলি ঐভাবে পেরিয়ে গেছে ; সেইসঙ্গে তিনি নতুন যোগাযোগের স্তরও তৈরী করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলা কবিতা সঙ্গীতের সহোদর বোন, রবীন্দ্রনাথ ঐ সত্য ধরতে পেরেছেন, সেজন্য তাঁর ছন্দের স্বভাব হচ্ছে দেশজ বাংলার চালে, কথ্যরীতির গতিতে। তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বাস উৎসারিত হয়েছে কর্মকাণ্ডহীন আধ্যাত্মিক উপনিষদ থেকে। ঐ সঙ্গে মিশেছে বৈষ্ণব কাব্য ও বাউলসাধনা। বৈষ্ণববাদ ও বাউলবাদ দুই-ই প্রতিষ্ঠান বিরোধী, প্রতিষ্ঠিত রীতি ধর্ম শক্তি বিরোধী। ঐ দুইয়েরই উৎস লোকজীবনে। অন্যপক্ষে ঐ দুইয়েরই সঙ্গীতধর্মী কথ্যভাষার ঝোঁককে তিনি নিজের নিয়মে বদলে নিয়েছেন। ঐ বদল তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মে, আর ঐ মেজাজ তিনি মিলিয়েছেন উপনিষদের কর্মকাণ্ডহীন নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে। আর সবকিছুকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন ফের নিসর্গ প্রকৃতির পটে। ঐ নিসর্গ তাঁর সামাজিক নিঃসঙ্গতার সমান্তরাল, অন্যপক্ষে তাঁর আত্মিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা। যেন আবেগ লোকে লোকান্তরে, জীবনে মননে ; ঐ আবেগের উৎস ব্যক্তিত্ব, ঐ ব্যক্তিত্ব প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে নিসর্গে, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনে, জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে মানসে ; অনবরত দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা ঐ সবকিছু

আক্রান্ত করেছে, কিন্তু মানবিক সম্ভ্রম বোধ সবকিছু ছাড়িয়ে উঠেছে। ঐ আবেগ যন্ত্রণা দ্বন্দ্ব এসেছে নিসর্গ থেকেই, কিন্তু ঐ নিসর্গ পশ্চিম য়ুরোপের পোষা নিসর্গ নয়, রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ নির্বিশেষ মানুষই, সেজন্য ঐ আবেগে উন্মীলিত হয়েছে হৃদয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, পৃথিবী প্রেম ; সুন্দরের সাহায্যে তিনি ধুয়ে মুছে দিতে চেয়েছেন কুশ্রীতার চক্রান্ত। ইংরেজ অভিঘাতের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশজ মেজাজের ভারসাম্যহীনতার চক্রান্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার মতো শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর ছিল। সেজন্য সুন্দরের কাছে নিজেকে সমর্পণের প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন, ঐ সমর্পণের নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের মেজাজ আত্মস্থ করে নিজের দেশের সংস্কৃতির পরিণতির কাজে ক্ষমতা উৎসর্গ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সমাজে সত্য ও কল্যাণের বোধ কাজ করেছে। ঐ দুই বোধ ব্যক্তিচরিত্রের ফ্রেম তৈরী করেছে, সমাজের ফ্রেম তৈরী করেছে। সত্য ও কল্যাণ পরস্পর প্রবিষ্ট, সেজন্য সত্য ও কল্যাণের সম্পর্কের বোধ বলীয়ান হয়ে দেখা দিয়েছে। নির্বস্তুক স্তরের ঐ বোধ সমাজ স্তরে কি ভাবে এসেছে কিংবা সমাজ স্তর উৎসারিত ঐ বোধ নির্বস্তুক স্তরে উপনীত হয়ে ব্যক্তির মানসে কিভাবে প্রভাব ছড়িয়েছে? রবীন্দ্রনাথের আগে সমাজে ও সাহিত্যে ব্যক্তির বোধ সবে তৈরী হতে শুরু করেছে। তখন থেকেই প্রশ্ন জেগেছে: যা ব্যক্তির সত্য তা কি সমাজের সত্য? কিংবা যা ব্যক্তির কল্যাণ তা কি সমাজের কল্যাণ? ঐ ব্যক্তি পরীক্ষা প্রয়াসী, বিবেক নির্ভর, যুক্তি অবলম্বী ; সে মুখ্যত মধ্যবিত্ত, শহরের বাসিন্দা, বাণিজ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংকীর্ণ একটি গোষ্ঠীর প্রতিভূ। তার কাছে কল্যাণ ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্য নাম : কল্যাণ হচ্ছে বন্ধন মুক্তি, ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধি। সেজন্য ব্যক্তি সমাজের বিরোধী শক্তি হিসেবে অনুভূত হতে শুরু করেছে। ব্যক্তি সমাজের অন্তঃস্থ, তার দরুন সমাজের সত্য ও কল্যাণ বোধ ব্যক্তিতে নিঃসৃত, কিংবা ভিন্নটাই। ঐ দ্বন্দ্ব ব্যক্তিক স্তরে উপপ্লব তৈরী করেছে, আবার নির্বস্তুক স্তরে অভিঘাত হেনেছে। রবীন্দ্রনাথে ব্যক্তির সত্য ব্যক্তির কল্যাণ বোধ প্রবল ও বলীয়ান এবং ঐ সব সমাজের বিরোধী ধারা হিসেবে উপস্থাপিত। সেজন্য তাঁর উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের প্রধান ও বলীয়ান দ্বন্দ্ব নিজেদের কাছে সত্য হতে পারা ; গোরা কিংবা শচীশ কিংবা কুমু সবাই নিজেদের জীবনে সত্যের পরীক্ষা অনবরত করেছে। ঐ পরীক্ষার টানাপোড়েনই উপন্যাসের ঘটনা ; দ্বন্দ্ব জর্জর তারা, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত, ব্যক্তিক ও নির্বস্তুক দুই স্তরেই তারা ঐ দ্বন্দ্ব অনুভব করেছে। ঐ দুই বোধের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন

সৌন্দর্য বোধ। ঐ বোধ ব্যক্তির সত্য ও কল্যাণকে সবল ও সার্বভৌম করেছে, বিচলিত চেতনার উপযোগী ফ্রেম ঐ বোধ সরবরাহ করেছে। জীবনে বেঁচে-থাকার জন্যই সুন্দরের দরকার; কিম্ভূতকিমাকার অপরিসর জীবন যাপনে সার্বিক ডিজাইনের খোঁজ আসে ঐ সুন্দর থেকে, ঐ বোধটি তিনিই প্রথম বাংলা সংস্কৃতিতে দুর্নিবার ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য কিংবা কল্যাণ সুন্দর বিহনে সার্বভৌম নয়, বরং ছিন্নভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে ঐ বোধের সাধনা করেছেন। বাস্তবে ঐভাবে তিনি এনেছেন ক্ষুব্ধতা, আলোড়ন, তীব্র গতি চঞ্চলতা; বাস্তবে ঐভাবে তিনি জীবনের জন্য সরঞ্জাম চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর জীবন যাপন ও সাহিত্য কর্ষিত, সজ্ঞান, সচেতন, সেজন্যই হয় তো কিছুটা কৃত্রিম, তাঁর বাস্তব পরিবেশ তাঁকে কৃত্রিম হতে বাধ্য করেছে কিংবা কৃত্রিম বলেই তিনি তাঁর কালে ব্যতিক্রম, সুন্দর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর বাস্তব পরিবেশ সুন্দরের বিরোধী, সেজন্য তাঁকে বারেবারেই ফিরে যেতে হয়েছে সুন্দরের খোঁজে, সুন্দরের কাছে, জীবনের মালমশলাকে তিনি সর্বময় রূপ ও ডিজাইনে অবগাহন করাতে চেয়েছেন বারবার, সে শুধু সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

বাস্তব থেকেই শুরু। সব শিল্পীর মতো রবীন্দ্রনাথও বাস্তব ধরতে গেছেন। কিন্তু সত্যি বাস্তব কি? বাস্তব কাকে বলে? ঐ সব প্রশ্নের জবাব শিল্পীরা খুঁজে চলেন সারা জীবন ধরে, আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে বাস্তবের অভিযানে বের হন, বাস্তব জয় করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা তাঁকে যে-আঙ্গিকের অধিকার দিয়েছে সেই ভাষা দিয়ে তিনি ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করেছেন। যে-ভাষা দিয়ে সত্তর বছর পর্যন্ত বাস্তব জয় করেছেন সেই ভাষাই তাঁর শেষ জীবনে বাস্তব বিজয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে, আঙ্গিক কুশলতা তাঁকে কৃত্রিম করে তোলে, ভাষার কয়েদী তিনি হয়ে ওঠেন। জয় যাঁর লক্ষ্য তাঁকে ফেরানো সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আঙ্গিকে বাস্তব বিজয়ে বের হলেন, যে-আঙ্গিকে তাঁর কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু যে-আঙ্গিক তাঁর জন্য নতুন, যে-আঙ্গিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বাস্তবও ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাস্তব দখলে আসে।

হয়তো ঐ ভিন্নতাই তাঁর শেষ জীবনের সাহিত্য চর্চা ও চিত্র সাধনার মধ্যে বর্তমান। সাহিত্য চর্চা যে-ক্ষেত্রে ক্ষীণতনু নন্দনতত্ত্বে আবদ্ধ, সেক্ষেত্রে চিত্রসাধনা প্রবল, বলীয়ান, বলিষ্ঠ ; জীবনের আবেগে কম্পমান ; সব কিছুই সেখানে উপস্থিত। সাহিত্যের সুন্দর সেখানে নেই, জীবনের ভাঙ্গা-চোরা বিষয়, বস্তুর বিশ্রী বিষয়, অভাব অনটনের পরিবেশ, প্রাত্যহিকতার দুঃস্বপ্ন তাঁর ছবিতে ধরা পড়েছে, ঐসব একাকার করে তিনি বের হলেন ফর্মের খোঁজে পেলব সূক্ষ্ম রুচি দুহাতে উড়িয়ে। যেন বিপ্লব শিল্পক্ষেত্রে, যেন রবীন্দ্রনাথ জেহাদ ঘোষণা করলেন নিজের বিরুদ্ধে ; এভাবেই শিল্প ও ব্যক্তিত্ব পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়ে পরস্পরের সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলা চিত্রকলার ঐতিহ্যের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যতিক্রম; স্পষ্ট উজ্জ্বল ব্যতিক্রম; একই সঙ্গে তিনি প্রতিবাদের নিশেন তুলেছেন বাঙালী মরমিয়াবাদ, রাখালীয়াপনার বিরুদ্ধে। ঐতিহ্যের আবিষ্কারের ফলে সামন্ত ঐতিহ্য, লোকজ ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ বাংলা চিত্রশিল্পের পথিকৃৎ। তিনি যে-ঐতিহ্য আবিষ্কার করেছেন তা খণ্ডিত, সামন্তবাদী; কোনারক, খাজুরাহোর; সেজন্য তাঁর লোকজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক উৎসাহ সত্ত্বেও তিনি উপস্থাপিত করেছেন দেশের খণ্ডাংশ, ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্ব; শিল্পতত্ত্বে এনেছেন ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর বাদশাহী মেজাজের সঙ্গে ঐ আবিষ্কার একাত্ম হয়েছিল, সেই সঙ্গে তাঁর জাপানী ওয়াশ আঙ্গিকের ব্যবহার ঐ মেজাজে এনেছে গীতিকবিতার বর্ণিলতা। ফলে বাংলাদেশের চিত্রকলার প্রস্তুতিপর্ব সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেল, তাঁর জাপানী ওয়াশ আঙ্গিক বাস্তবকে করে তুলল অ-ধরা, সুন্দর, তনুস্বচ্ছ; রং হল নরম, নমিত, কবিতার সহোদর বোন যেন।

প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য উৎসারিত হল কলকাতার আর্ট স্কুল থেকে। রেনেসাঁস প্রবর্তিত একক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চলতা ঐ স্কুলে শেখানো হতে লাগল, তাই বস্তুর একদিক চোখে প্রতিভাত হল, কিন্তু বস্তুর অন্বেষণ, অভীপ্সা ও অভিযান ঐ একক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চলতা দিয়ে যে বোঝা যায় না সেই বোধ থেকে গেল গরহাজির হয়ে। অন্যপক্ষে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পের একটি পর্বের বিষয় ও সমস্যা বোঝা যায়, কিন্তু শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব বোঝার বাইরে থেকে যায়। ঐ একক দৃষ্টি-ভঙ্গির নিশ্চলতা কিংবা ড্রইং ক্লাস দৃষ্টিভঙ্গির ওপর অভিঘাত ছড়িয়েছে মধ্য-ভিকটোরীয় নীতিবাদ, তাই ছবিতে বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে গীতিকাব্যধর্মী পেলব, সুন্দরপনা; নিসর্গ তাই উধাও নদীর বিস্তার কিংবা রাখালিয়া মাঠ; নারী ও পুরুষ তাই সুকুমার; বাস্তব এভাবেই হয়ে উঠেছে প্রতারক পরিবেশ।

লোকজ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে কড়া রং ও লাইনের ব্যবহারে, বাস্তব মূলত ফিগরটিভ, কিন্তু ঐ ঐতিহ্যের ভিত্তি দ্বিরায়তনিক, তাতে ভল্যুম নেই, ম্যাস নেই। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের ঐসব সমস্যা দুজনের কাছে ধরা দিয়েছে। দুজনই আক্রমণ করেছেন সমস্যা দুই ভিন্নভাবে। যামিনী রায় গেছেন বস্তু অতিক্রম করে আর রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত করেছেন

দৃশ্যমান বাস্তবের বদলে ভিন্নতর বাস্তব, এভাবেই দুজন ঐ তিন ঐতিহ্য আক্রমণ করে, সমস্যা বুঝে, সমাধানের মালমশলা উপস্থাপিত করে বাংলাদেশের চিত্রকলাকে আধুনিক বিশ্বের অন্তর্গত করেছেন।

ভাবপরিমণ্ডল ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রচলিত ধারা অস্বীকার করেছেন। তাঁর ছবির ভাবপরিমণ্ডলে গ্রাম্যতা নেই, কাব্যপনা নেই; আছে ঋজুতা, কঠিনতা; তাঁর রং নরম, নমিত নয়; ভাস্বর, স্পন্দিত। বাংলাদেশের চিত্রে অভাব আছে ভল্যুম ও ম্যাসের। প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দেয়া যায় না ঐ বোধ থেকে মোঘল শিল্পী, রাজপুত শিল্পী, পাহাড়ী শিল্পী রংয়ের নানা অস্ফুট টোন বর্জন করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন রংয়ের জোরালো বৈষম্য, তাই ছবিতে তাঁরা ব্যবহার করেছেন কড়া রং উজ্জ্বল রং; বর্ণচ্ছটার বর্ণালিবিভঙ্গ ব্যবহার ত্যাগের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির সমান্তরালে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই সঙ্গে ত্যাগ করেছেন ছবিতে গভীরত্ব, ঘনত্ব, ভল্যুম ও ম্যাস। য়ুরোপীয় ছবির গভীরত্ব, ঘনত্ব আনতে হবে নির্দ্বিধায় রবীন্দ্রনাথ মেনে নিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মেনে নিলেন ঐ গভীরত্ব, ঘনত্ব আনতে হবে উজ্জ্বল রংয়ের মধ্যে দিয়ে।

সমস্যার অন্য একটা দিকও আছে। প্রাচ্য চিত্ররীতির ভিত্তিই হচ্ছে দুইমাত্রা, দ্বিরায়তন, ফ্ল্যাট জমিতে আলঙ্কারিক প্রতিমার প্রতিভাস ও বিন্যাস। প্রাচ্যরীতিতে কাগজ কাগজই, রং ও রেখা রং ও রেখাই, ছবিতে নিসর্গ, বস্তু কিংবা ফিগর প্রতিষ্ঠা পায় মুখ্যত রেখা, গৌণত রংয়ের সাহায্যে। ইংরেজ-রাজ প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুল শিখিয়েছে তিন মাত্রার বিন্যাস, আর দেশজ ঐতিহ্য শিখিয়েছে দুই মাত্রার বিন্যাস। ঐ দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন প্রস্তুতিপর্বের অধিকাংশ শিল্পীই। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যরীতির দুইমাত্রা থেকে সরাসরি এগিয়েছেন য়ুরোপীয় তিন মাত্রার দিকে, কিন্তু তাঁর ছবিতে থেকে গেছে দুই মাত্রার প্রাধান্য, তিন মাত্রার দিকে অভিযান ও দুই মাত্রার প্রাধান্যের মাধ্যমেই তাঁর চিত্র ভাষা তৈরী হয়েছে, আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে তাঁর সফল সংলাপ সম্ভব হয়েছে।

অন্যপক্ষে তিনি রংয়ের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছেন নানা রং মিশিয়ে, সমন্বয় করে। ঐ মিশ্রণ ও সমন্বয় থেকে তৈরী হয়েছে নতুন উপাদান, ঐ উপাদান ব্যবহার করে তিনি ফ্ল্যাট জমিতে রংয়ের তীব্র জৌলুষ এনেছেন: এভাবেই গভীরত্ব, ঘনত্ব দেখা দিয়েছে ছবিতে। রংয়ের পর রং তিনি লেপে দিয়েছেন

কাগজে, রং যেন ফুটে বের হচ্ছে কাগজের মধ্যে থেকে, বুঝি বিচ্ছুরিত দ্যুতি, যে-রং ঘুরে ঘুরে দেখা যায়, রং এভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বকীয়তায় তাঁর ছবিতে। রং এতদিন উপলক্ষ ছিল, ভাবের প্রতীক ছিল, প্রকৃতির ঋতুরঙের মেজাজের। রবীন্দ্রনাথে রং এই প্রথম হল মুখ্য, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, চিত্রের সঙ্গে একাত্মক।

নতুন আঙ্গিকে তাঁর বাস্তব বিজয়ের অভিযানে বেশ কয়েকটি পরম্পরা আছে। প্রথম পর্যায়ের আভাস তাঁর হাতের লেখার কাটাকুটিতে। ঐসব নিছক আঁকা বাঁকা রেখা। দ্বিতীয় পর্যায় এসেছে কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে জন্তু, লতা-পাতার দূর আভাস, চোখমুখের ইঙ্গিত, আজগুবি জন্তুর শরীর, মাথা কিংবা পা। তৃতীয় পর্যায় 'পূরবী'র পাণ্ডুলিপি। হাতের লেখা ফুটে বেরিয়েছে নানা আকার, কাল্পনিক অলঙ্কার, প্রাকৃতিক জীবজন্তুর আভাস, আরণ্যক নিসর্গের ইঙ্গিত। এসবই দুই মাত্রিক। চতুর্থ পর্যায়ে তিনি সরাসরি ছবি আঁকতে শুরু করেছেন শাদা কাগজে, বিষয়: বস্তুবিচ্ছিন্ন কল্পনার, খেয়ালের। এই প্রথম শুরু হল বস্তু অতিক্রম করা, দৃশ্যমান বাস্তবের বদলে ভিন্নতর বাস্তব প্রতিষ্ঠা করা। ছবিতে থাকল দুই মাত্রাই, কিন্তু চোখের দেখা চোখের চেনার বদলে কিংবা বাতিল করে অ-দেখা, অ-চেনা, স্মৃতি, স্বপ্নের মালমশলার ব্যবহারের ফলে তাঁর ছবি ফটোগ্রাফীর দুই মাত্রিক কারাগার থেকে মুক্তি পেল। বুঝি তিনি যাত্রা শুরু করেছেন দুই মাত্রার খাঁচা ছেড়ে তিন মাত্রার দিকে। পঞ্চম পর্যায়ের বিষয় নিসর্গ, পোর্ট্রেট, বাড়িঘর, ফিগর। ছবিতে এল ঘনত্ব, গভীরত্ব, রংএ এলো টেক্‌চার, ছবি হল তিন মাত্রিক। ঋজুতা, কঠিনতা, কাঠামো ও সংগঠন এলো যা-কিনা বাংলা দেশের ছবিতে আগে কখনো আসেনি।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব ছবি এঁকেছেন 'পেলিক্যান' কালিতে। তাঁর ছবিতে রং-এরও পরম্পরা আছে। প্রথম প্রথম কালো কালি, পরে একই রং এর ভিন্ন টোন, হাল্কা নীল গাঢ় নীল, আরো পরে লাল কালো কিংবা লাল নীল এবং সব শেষে সব রংই এসে গেল, কাগজ ফেটে দ্যুতি বের হল, কিংবা কাগজ ফুটে আভা বের হল, স্পন্দিত উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত বিচ্ছুরিত দ্যুতি কিংবা আভা। তাঁর ফিগর কিংবা আকৃতি কিংবা আকার; তাঁর রজনীগন্ধা, মুখোশ, নিসর্গ দৃশ্য, আঙ্গুরলুব্ধ হরিণ, যুগল কাগজের শাদা জমি ও রেখার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ; রেখা তাঁর গতি চঞ্চল, রেখার মধ্যে আছে একটা ডায়নামিক পয়েণ্ট, রেখা ও রংয়ের নিখুঁত সংস্থানের ফলে ছবিতে এসেছে উচ্ছলতা। তাঁর ছবিতে এসেছে ইমপাষ্টোর জমক, এনামেলের ঐশ্বর্য, হীরকের দ্যুতি, বিভিন্ন রংএর বুনুনির টেক্‌চার। অন্যপক্ষে রেখা নানা অসম আকার,

আকৃতি, ফিগরে তৈরী করেছে টেনশন, ঐ টেনশন রংএর মধ্যে দিয়ে তিনি গেঁথে তুলেছেন রীতিদুরস্ত ফর্মাল বিন্যাসে, এভাবে তৈরী হয়েছে ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথ এভাবেই সজ্ঞানে তাঁর সাহিত্যের সুন্দর বিষয়, সুন্দর দেহ, সুন্দর বর্ণনা, সুন্দর নিসর্গ ঠেলে ফেলে দিলেন, আঁকলেন অ-সুন্দর, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর, দুঃস্বপ্ন, ছেঁড়া খোঁড়া এলোমেলো জীবন। সেজন্যই তাঁর ছবিতে বারে বারে ফুটে উঠেছে রংএর ঔজ্জ্বল্য সত্বেও অসন্তোষ, রেখায় এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ মুক্তির দ্যোতনা, ঐ সংঘাতের উৎস শ্বাসরুদ্ধকর পারিপার্শ্বিকতা। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে অধীর হয়ে দৃশ্যমান বাস্তবের কারাগার ভেঙ্গে দিয়ে বের হলেন বিপর্যয়সঙ্কুল প্রাত্যহিকতায়, যখন দেশে চলেছে স্বাধীনতার অভিযান, চীন আক্রমণ করেছে জাপান, স্পেনে চলেছে মানবিকতার হত্যা, ফাসিজম মাথা তুলেছে ইটালিতে জার্মানিতে, যখন দেশবিদেশ অশান্ত, ছিন্নভিন্ন, আসন্ন প্রলয়ে উৎকণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ, বিচলিত; রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন দেশবিদেশের ঐ পটেই, ঐ চেতনাই একাকার হয়ে গেছে তাঁর ছবির ফর্মে ও রূপে।

কবিতার স্বাধীনতা ঃ নজরুল ইসলাম

প্রতিষ্ঠিত রীতি ও অনুকৃত রীতির মধ্যেকার দ্বন্দ্বই শিল্প। নজরুল ইসলাম যে-সময়ে লেখা শুরু করেছেন সে-সময়ে রবীন্দ্র-রীতি ও রবীন্দ্র অনুকৃত রীতি দুই-ই প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতাশালী, বলীয়ান। অনুকৃত রীতিতে রবীন্দ্রনাথের চারিত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের শিথিলতা কিংবা দোষসমূহ বেজে বেজে উঠেছে, ঐ ধ্বনি আবৃত করেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুর। নজরুলের কৃতিত্ব ঐ দ্বন্দ্ব তিনি নিজের নিয়মে বুঝেছেন, সাবলীলভাবে তাই পেরিয়ে যেতে পেরেছেন অনুকৃত রীতির প্রভাব, রবীন্দ্র রীতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেছেন বাংলা কবিতার অবাধ ঐতিহ্য ; তিনি শিখিয়েছেন প্রতিষ্ঠার মধ্যে মৌলিকতা এবং জীবনেই বাঁচতে শেখা। তিনি তাঁর কালেরই, ঐ কালের সংস্কার তিনি মেনেছেন, প্রতিফলন করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি কালের পরপারে। ঐ অসম্ভব তিনি সম্ভব করেছেন অজস্র আবেগ, প্রেম ও ঘৃণার মাধ্যমে, কালের সকল বৈপরীত্য অফুরন্ত সততার সঙ্গে জীবন যাপন করে ; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জীবন যাপনের মালমশলা থেকে কবিতা তৈরী হয়, কবিতার উপকরণ নিরপেক্ষ, নন্দনতাত্ত্বিক কিংবা নিজের গুণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেজন্য সকল পথ দিয়ে তাঁর দিকে যাওয়া যায় এবং তাঁর প্রতিটি পথ দিয়ে সকলের দিকে যাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই হচ্ছে তাঁর শিল্পের স্বরূপ।

সমাজের সঙ্গে শিল্পের যে-বিরোধ তার সাময়িক সমীকরণ নজরুলের কাজে হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরেই ঐ বিরোধ নতুন ও তীব্র মোড় নিয়েছে : শিল্প হয়ে উঠেছে স্থায়ী এক বিপ্লব। বাংলা সমাজের মৌল পরিস্থিতি নজরু-লের সময় থেকেই বিপ্লব সম্ভবা ; অথচ সমাজ বিপ্লব রক্ষণশীল নন্দন-তত্ত্বের খোঁজ করে চলেছে, অন্যপক্ষে নন্দনতাত্ত্বিক বিপ্লব, শিল্পীর ব্যক্তিক উৎকর্ষতা সত্ত্বেও, সমাজক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা আহ্বান করেছে। এক হিসেবে

রবীন্দ্রনাথ থেকে, কিন্তু স্পষ্টতই নজরুল থেকে ঐ সমস্যা শুরু। তাঁর কাজ উদ্দেশ্য চেতন, উদ্দেশ্যচেতনার ভিত্তি অন্তর্দীপ্ত বাস্তবতা। ঐ বাস্তবতা কি শিল্পী কিংবা পূর্বতন ঐতিহ্যের উল্লেখ ছাড়া বোঝা সম্ভব? ঐ কারণে এখান থেকেই শুরু, নজরুল বাধ্য করেছেন শিল্পকে পূর্ব নির্ধারিত অর্থের উদ্ভাবনে। অন্যপক্ষে পূর্বনির্ধারণ থেকে বিচ্যুতির সূত্রপাত ঘটে। আর অর্থের প্রত্যাখ্যান করলে পৌঁছুতে হয় নির্বস্তুকতায়, ব্যক্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষায়, স্বাধীনতায়। কি নেবে শিল্পী মুক্ত অথচ নির্বস্তুক শিল্প, কিংবা কংক্রীট অথচ শিথিল শিল্প? লোকসাধারণ অথচ অজ্ঞ, কিংবা শিক্ষিত অথচ সীমাবদ্ধ রুচি?

সমসাময়িক জীবন সম্বন্ধে নজরুল হচেছন সর্বোত্তম মল্লিনাথ। সচেতন ভাবেই তিনি সমসাময়িক জীবনের ব্যাখ্যান করেছেন। তাঁর বিষয় নির্বাচন এবং উপস্থাপিত করণের অন্তরঙ্গতা ও স্বাভাবিকতা সমসাময়িকতা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্জ্ঞানের ইঙ্গিতবহ। এ ভাবেই নজরুল সমসাময়িক জীবনের রূপ-কল্প কাবিতার উপকরণ হিসেবে অনুভব করেছেন। জীবনের খুঁটিনাটির দৃশ্যঘনতা তাঁর কবিতা ও গানে জড়ানো; খুঁটিনাটির মোজেইক থেকে প্রতিবেশ ও মনোজ উভয় দিক থেকে তিনি নির্মাণ করেছেন জীবনের কাব্যিক মিনার, বুঝি তিনি লিখেছেন উপস্থিত সময় সম্বন্ধে, কবিতায় এনেছেন বিপ্লবের সমান পরিস্থিতি বাস্তবিক জীবনের প্রবাহ ও প্রতিভাস তাঁর কাজে অধিকার করে।

তাঁর পরে, বাস্তবতার অমন ব্যবহারের সমাপ্তি ঘটেছে। বাস্তবতার ঐ ব্যবহার, জীবনের অমন উপস্থিতি তাঁর কবিতায় বিষয়ের দিক থেকে বিপ্লব এনেছে, কারণ বিষয় তাঁর কাছে নিরপেক্ষ নয়, বিষয় ব্যক্তির আবেগের অধীন, সেজন্য বিষয়ই কবিতা। ব্যক্তি, পরিবেশ, সময়, মানুষী অবস্থার সমগ্রতাই বিষয়, তাই তাঁর কবিতা বিষয় আক্রান্ত, বিষয় অবিরাম অনবরত; যেন বিষয়ের অভিঘাত থেকে তাঁর কবিতা উৎসারিত হয়েছে। অন্যপক্ষে নজরুল মানুষী বিষয়ই বেশী পছন্দ করেছেন, সেজন্য মানুষী বাস্তবতা তাঁর কবিতার চারিত্রে এনেছে সমাজ বিপ্লবের ছন্দ, যে-ছন্দের সঙ্গে বাংলা সমাজের মৌল পরিস্থিতির নিবিড় গভীর মিল আছে।

সমাজের বিপ্লব, এভাবে, কবিতায় দেখা দিয়েছে, কবিতা হয়ে উঠেছে সমাজের আত্মপ্রকাশ, বদলি-বিপ্লব কবিতার পরিসর বাড়িয়েছে, অন্য পক্ষে কবিতাকে জখমও করেছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার বিষয় হিসেবে যা নির্ধারণ

করেছেন তার বিপরীতে কবিতার পরিসর বেড়েছে, কিন্তু সমাজের বিপ্লব, সমাজের বদলে কবিতাতে উৎপন্ন হওয়ায় কবির ভূমিকা ও কবিতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে নজরুলের কৃতিত্ব স্মরণীয়, সেই সঙ্গে স্মরণীয় বিষয়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত কবির ভূমিকা। হয়তো ঐ কারণেই লোকসাধারণ কবিতায় ফলিত দিকটি বড়ো করে দেখেছে, কবিতা বলতে বুঝেছে সামাজিকতা, রাজনীতিকতা ; সমাজে যা ঘটেনি কবিতাতে সে সবই ঘটাতে চেয়েছে। এভাবেই তৈরী হয়েছে নজরুলের কবিতার নন্দনতত্ত্ব, তাঁর সমাজবিপ্লব রক্ষণশীল নন্দনতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, নন্দনতত্ত্বকে প্রয়োজনের খাঁচায় আবদ্ধ করেছে। নজরুলের পরের তিরিশের কবিরা, রক্ষণশীল নন্দনতত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন, বিষয় সর্বস্ব কিংবা সাময়িক প্রসঙ্গ চেতন কবিতার বিপক্ষে তৈরী করেছেন ভিন্ন বক্তব্য ; কবিতার উপকরণ তাঁদের কাছে নিরপেক্ষ, কবির দায়িত্ব ঐ উপ-করণের মধ্যে দিয়ে নিজের চেতনা স্পষ্ট করা। তাঁদের কাছে বিষয় কবিতা নয়, বিষয়হীনতার দিকে তাঁদের যাত্রা। এভাবেই দেখা দিয়েছে নির্বস্তুকতা, মুক্তি ; কবিতা পেরিয়ে গেছে গণ্ডী।

কবিতার ভিন্ন এক চেহারা তৈরী করেছেন তাঁরা। কবিতার জন্য নয় নিছক ঘটনা কিংবা কাহিনী, নির্দিষ্ট সংজ্ঞা, বরং বহুমুখিতার জন্য তার তৃষ্ণা। ঐ কারণেই কবিতায় তাঁরা এনেছেন মুখের ভাষার আদল, প্রবন্ধের ধাঁচ, দার্শনি-কতা, অস্তিত্বের উদ্বোধন ; বিষয় : জটিল চঞ্চল বিক্ষুব্ধ সময়, কেন্দ্রবাসী নিঃসঙ্গ/ সংগ্রামী মানুষ। তাই কবিতা কখনো ভাষার নিরীক্ষা, কখনো প্রবন্ধের মতো সংহত, কখনো দর্শনের যুক্তিরীতি, কখনো বা চিত্রের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধির জাগরণ ; সবকিছুতে লিপ্ত আর্ত ও ব্যাকুল মানুষ, সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়া। কবিতা চেয়েছে অসম্ভব হতে, সেজন্যই আত্মপরীক্ষা, আত্মসন্ধান, কিংবা স্বগতোক্তি ; কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ব্যঞ্জনা, রুদ্ধশ্বাস অনুভূতি, কঠিন দর্শন, সাংসারিক তথ্য, দূরে সরে গেছে পূর্বতন ফ্রেম, আধো অন্ধকারে এক প্রেত-লোকে, জীবিতের পরিত্যক্ত ; শুধু আছে জান্তব, কম্পমান অস্তিত্ব। ঐ অস্তিত্বের নির্ধারণের জন্যই কবিতার নতুন ফ্রেম তৈরী হয়েছে। নির্ধারণের মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা অন্তরিত। প্রতিরোধ বাস্তবের বিরুদ্ধে, যে-বাস্তব মানুষকে সত্য হতে দেয় না, সেজন্য তৈরী হয় মিথ্যা, আর ঐ মিথ্যা ভাষাকে গ্রাস করে। ভাষা তখন ভয় পায়। আর যে-ভাষা ভয় পায় সেই ভাষা দিয়ে কি বাস্তব আক্রমণ সম্ভব? প্রতিরোধ তাই বাস্তবের বিরুদ্ধে, অন্যপক্ষে ভাষায় তৈরী বাস্তবের বিরুদ্ধে। জীবন যাপনের বাস্তব মেনে নিলে বলার কিছু থাকে না,

ব্যক্তি তখন বাস্তবের ডাকপিওন। জীবন যাপন যে-কারণে সত্য হতে ভয় পায় সেই বোধ সমূহ ধরা কবিতার পূর্বতন ফ্রেমে সম্ভব নয়। অথচ পূর্বতন ফ্রেম তৈরী করে কবিতা বিচারের বোধ। শুরু হয় তখন প্রতিরোধ : পূর্বতন ফ্রেমের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় অভিজ্ঞতার বিন্যাস। কবিতা এভাবেই এগোয় এবং এভাবেই ঝেঁটিয়ে দূর করে পূর্বতন ফ্রেম অভিজ্ঞতার জীবন্ত বিন্যাসের সপক্ষে।

ঐ তিন স্তরের প্রতিরোধ পরস্পর প্রবিষ্ট : বাস্তব, ভাষা, ফ্রেম। বাস্তবের আক্রমণ ভিন্ন হয়, ভাষায় সংক্রমিত হয় ঐ আক্রমণের প্রয়াস এবং ঐ প্রয়াস জীর্ণ করে কবিতার ফ্রেম। সব কিছুই উৎসারিত প্রতিরোধ থেকে, সেজন্য ব্যক্তিকে বোঝাপড়া করতে হয় সময় ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। অন্য পক্ষে যে-কবি সাহিত্যিক রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন তাঁকে তা করতে হয় তাঁর নিজস্ব ধারায় ও প্রথায়, তাঁকে করতে হয় লিখিত শব্দের মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে তাঁর শব্দের যন্ত্রণায় মিশে যায় ব্যক্তিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর শব্দে সর্বস্ব হয় মানুষ। প্রতিরোধ নিভৃত ধ্যানে কিংবা প্রতিরোধ মানুষে নিরন্তর, নির্ভরশীল তা ব্যক্তির ওপর। কিন্তু শব্দে এখন জীবিতেরা, যে-ভাবে তারা পিঠে বাস্তব ঠেকিয়ে চেয়ে আছে : বাস্তব মনে পড়ায়, সংগ্রাম করায়, বহু পথ পার করায়। তাঁরা শিখিয়েছেন কবিকে প্রতিরোধ করতে হয় মিথ্যা বাস্তব, মিথ্যা ভাষা, মিথ্যা ফ্রেম। সত্যতর বাস্তব, সত্যতর ভাষা, সত্যতর ফ্রেম চিনে চিনে তাঁকে কবি হতে হয়। যে-বাস্তব পূর্বতন কবিতে সেই বাস্তব তৈরী করেছে ঐ নিয়মানুগ ভাষা, ঐ নিয়ম ফের তৈরী করেছে বিচারের ফ্রেম। যে-কবি এখনকার তাঁর প্রতিরোধ ঐ বাস্তব ঐ ভাষা ঐ ফ্রেমের বিরুদ্ধে। পূর্বতন কবিতার বাস্তব যদি তাঁকে গ্রাস করে তখন যে-বাস্তবে তাঁর জীবনযাপন তাঁর শরসন্ধানের পর-পারে তা থেকে যায়, তাঁর ভাষা হয়ে উঠে শব্দের সৌজন্য। এভাবেই ভাষা তাঁকে মিথ্যা শেখায়, তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ভাষার স্বাধীনতা। জীবন যাপনের বিরোধের মধ্যে সবাইকে বড়ো হতে হয়। ঐ বিরোধ জীবন যাপনের বাস্তবে, সেইসঙ্গে শিল্পের বাস্তবে। পরস্পর প্রবিষ্ট ঐ বিরোধ, যেহেতু শিল্পের কেন্দ্রবাসী জটিল চঞ্চল বিক্ষুব্ধ সময়, সে জন্য নিঃসঙ্গ মানুষ এবং সংগ্রামী মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, দুজনেরই প্রতিরোধ মিথ্যা বাস্তবের বিরুদ্ধে। একজন আর্ত ও ব্যাকুল মানুষ কিংবা একদল সংগ্রামী মানুষ নিরন্তর বোঝাপড়া করছে ঐ জটিল চঞ্চল বিক্ষুব্ধ জগতের কেন্দ্রবাসী হয়ে। সংগ্রামের পদ্ধতি তাই গভীরে কিংবা প্রসারণে, আত্মপরীক্ষার বিপরীতে মানবিক দায়িত্বে, কিন্তু নিরন্তর বোঝাপড়া, অর্থ খোঁজা, ঐ সন্ধানই মনুষ্যত্ব। ঐ কারণেই কবিতায়

এসে গেছে সাহিত্যের নানান শাখার নৈপুণ্য : উদ্দেশ্য একটাই বাস্তব করায়ত্ত করা। সেজন্য কবিতার ফ্রেমে এসে গেছে নানান আগ্রহ, ন্যায় বিশ্বের বিশৃঙ্খলার বিলাস, অন্যপক্ষে খণ্ড চৈতন্যের প্রত্যক্ষধর্মিতা ; চেতন ও অবচেতনের সাম্য। এভাবেই কবিতা ও কবির ভূমিকা একেবারে ভিন্ন, নতুন হল, কবির পাঠক কবি নিজে, কবিতার মূল্য কবিতাতে, রুচি এ পথে সংগঠিত হল, কবিতা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকসাধারণের ব্যবহারের জিনিস নয়, কবিতা বিশেষ চেতনা প্রক্রিয়া, কবিতা বোঝার জন্য দরকার তাই শ্রম, অভিনিবেশ, মনোযোগ। নন্দনতত্ত্বের ঐ বিপ্লবের সামাজিক অভিঘাত রক্ষণশীল, তিরিশের কবিতা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এখানেই।

নজরুলের বিপরীতে এও এক ধরনের বিচ্যুতি : শিল্প ও সমাজ দ্বন্দ্বের ভিন্ন এক উদাহরণ। ঐ দুই নন্দনতত্ত্বের অন্তঃস্থিত দাবি হচ্ছে : কবিতার মান হ্রাস করা কিংবা লোকসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নীত করা। হয়তো ঐ দুই দাবি অর্থহীন, হয়তো ঐ দুই দাবি উৎসারিত হয়েছে সমাজ ও শিল্পের সমীকরণের প্রয়াস থেকে, যেন দাবি শিল্প ও সমাজের মিলন হোক মাঝারি অবস্থায়, যে-অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা সন্দেহের চোখে দেখে, যে-অবস্থা বাস্তবের বিপ্লবী ব্যবহারের বিরোধিতা করে। আসলে নজরুল তা চাননি, তিরিশের কবিরাও নন। যেন এক বৃত্ত, ঘুরে ঘুরে ফিরেছেন তাঁরা ; নিজেরাই বন্দী থেকেছেন কবিতার স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে ; এই এক বৈপরীত্য, নির্মম, নিষ্ঠুর।

একজন সৎ ব্যক্তির হৃদয়

যুক্তিবাদী তিনি, কিন্তু ধর্মে সমর্পিত। যুক্তি দিয়ে তিনি জগৎসংসার স্বকাল বোঝার চেষ্টা করেছেন আর ধর্মের বোধ থেকে তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রত্যয় বিকিরিত করেছেন। সেজন্য তাঁর যুক্তিনিষ্ঠতা ধর্মবিরোধী নয়; যুক্তি তাঁর কাছে বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ। ধর্মবোধ তাঁর কাছে জীবনের ভিত্তি, যুক্তি দিয়ে তিনি ঐ ভিত্তি প্রসারিত করেছেন। ধর্মবোধ তাঁর কাছে সত্যচর্চার নামান্তর, আর সত্য অর্জনের জন্য দরকার যুক্তিচর্চা। ঐ কারণে সত্য, ধর্ম, যুক্তি তাঁর কাছে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরপ্রবিষ্ট, পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং ঐ পথেই মুক্তি। কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তার কেন্দ্রস্থল বোধ হয় এখানেই।

যুক্তিবাদ দুই উৎস থেকে উৎসারিত: ভাববাদ ও ইতিহাস। প্রথমটিতে ভাবনা বলীয়ান, ভাবনা ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। দ্বিতীয়টিতে কংক্রীট জীবনযাপনের মালমশলাই প্রধান উপকরণ। প্রথমটিতে ইতিহাসের কালপ্রত্যয় একাকার, দ্বিতীয়টিতে ইতিহাসের কালপ্রত্যয় প্রবল। সেজন্য উৎসের ভিন্নতা যুক্তিচর্চার চরিত্র ভিন্ন করে তোলে, যিনি যুক্তিচর্চা করেন তাঁর মানসিক ঝোঁক, প্রবণতা স্পষ্ট করে তোলে। কাজী আবদুল ওদুদের জীবন-জিজ্ঞাসার উৎস ভাববাদ, তাঁর বুদ্ধিচর্চা ঐ ভাববাদের প্রসারণ, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারে আস্থা ও বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু যে-কালে তিনি বুদ্ধিচর্চা করেছেন সেই প্রাদেশিক সময়ের বাসিন্দারা তাঁকে অনবরত ঘিরে রেখেছে। সেজন্য তাঁর বুদ্ধিচর্চা, অন্তিম বিশ্লেষণে, শৌখিন হিসেবে থেকে যায়, ব্যক্তির অবলম্বন হিসেবে টিকে যায়, কিন্তু সমাজের ওপর দূরস্পর্শী অভিঘাত ছড়াতে অক্ষম হয়। ব্যক্তি কি নিজেকে খেয়ে টিকে থাকতে পারে? বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এখানেই। কাজী আবদুল ওদুদ শিখার মতো জ্বলেছেন চারপাশের অন্ধকারে, বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ শিখার মতো

নিজেকে তুলে ধরেছেন, যদি চোখে পড়ে, কারো চোখে পড়ে। সেজন্য বোধ হয় বুদ্ধিজীবীর ঐ ভূমিকা লাইটহাউসের মতো, তার বেশী নয়, ঐ ভূমিকার নিঃসঙ্গ সাহস প্রশংসা কাড়ে, আবেগ জাগিয়ে তোলে, কাজী আবদুল ওদুদের দিকে ঐ চোখে আমি তাকিয়ে।

বাংলাদেশ, বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রধান পুরুষদের তিনি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবেই। যেন দেখেছেন ঘুরে ঘুরে, বারে বারে, যেন ঐসব স্থাপত্য, নির্মম নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। 'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ' প্রবন্ধে তিনি উন্মোচন করেছেন জাতীয়তার সাম্প্রদায়িক ঝোঁক, উন্মীলিত করেছেন বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রধান পুরুষদের উগ্রতা, ভাবোন্মত্ততা, খেয়ালীপনা; ঐ উন্মোচন নির্মম কিন্তু নির্মল, ঐ উন্মীলন তীক্ষ্ণ কিন্তু লাবণ্যময়; ব্যক্তি আবদুল ওদুদ এখানে যেন হাজির, যুক্তি দিয়ে যিনি কথা বলতে ভালোবাসেন, কিন্তু চিৎকার করে নয়। কিন্তু তাঁর নিদান বাস্তবসম্পর্কশূন্য, হয়তো বুদ্ধিচর্চার ব্যক্তিক ট্র্যাজিডি এখানেই। ইতিহাসের একটি নির্ধারিত পট তাঁর বুদ্ধির আলোকে দীপ্ত হয়, যুক্তির পরম্পরা ও শৃঙ্খলায় সজ্জিত হয় তত্ত্ব ও তথ্য; কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে ঐ বুদ্ধির আলোক ক্ষীণ ও ক্ষণিক, যেন লাইটহাউস ঘিরে কুয়াশা, গভীর, গাঢ়, দৃষ্টি লুপ্ত করা। তখন শুধু জপ করা শুভবুদ্ধির ও সত্যাশ্রয়ের।

তিনি যে-সময়ে কাজ করেছেন সে-সময়ে ধর্ম, সমাজ, সত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জেগেছে। তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন যে, ধর্ম সাধারণের ব্যবহারে পরিণত হয়েছে বলে ধর্মের যুক্তিশুদ্ধতা কমে গেছে। লোকসাধারণ পরিচিত অস্বচ্ছ অভ্যাসে শান্তি পাচ্ছে। সমাজ আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কতকগুলো স্থির সিদ্ধান্তের কয়েদী হয়ে। সেজন্য তিনি কতকগুলো মৌল প্রশ্ন তুলেছেন: মানুষের কি দরকার? স্বাধীনতা কিসের জন্য? তাঁর সমাজধ্যান থেকে তিনি জবাব পেয়েছেন: মানুষের দরকার কল্যাণ, স্বাধীনতা দরকার ব্যক্তির জন্য। এভাবেই কল্যাণ ও স্বাধীনতা তিনি সমার্থক ভেবেছেন, বুদ্ধি তাঁর কাছে মুক্তির ভিন্ন নাম বলে প্রতিভাত হয়েছে। ঐ কারণে তাঁর যুক্তিচর্চার অর্থ সত্যের নির্মলতম মর্মে প্রবেশ, ঐ প্রবেশের পথে যেতে যেতে ব্যক্তি আলোকিত হয়, কল্যাণ ও মুক্তির অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে যুক্তিশুদ্ধতা গড়ে তোলে, চেতনার অভিযান ধর্মের সংস্কার, অনুভূতির অভ্যাস, বিশ্বাসের শান্তিতে আঘাত হানে; ঐ আঘাতের উদ্দেশ্য যদি ধর্ম শুদ্ধ হয়ে যুক্তিরীতির উপায়ে ফের ফিরে আসে' সত্যের উৎসারণ ঘটে, ব্যক্তির সাধন-সঙ্কল্পে মুক্তির প্রেরণা উজ্জ্বল হয়।

কাজী আবদুল ওদুদ বুদ্ধিচর্চা করেছেন উনিশ শতকের যুক্তিবাদের ফ্রেমে। ঐ ফ্রেম তাঁর মানসিক ঝোঁক নিরূপণ করেছে। সেজন্য তাঁর ইতিহাসবোধ উনিশ শতকে আবদ্ধ কিংবা উনিশ শতকের একটি বিশেষ পর্বে আবর্তিত। হয়তো ঐ কারণে তাঁর ইতিহাসবোধ তাঁকে ব্যক্তির কাছে এনে দিয়েছে, ব্যক্তিকে তিনি মূল্যবোধের অন্তিম মনে করেছেন, যেন ব্যক্তি-উৎস মুক্তির, কল্যাণের, নিদানের। কিন্তু মুক্তি তো ব্যক্তির নয়, সকলের; মুক্তি তো ব্যক্তিতে বন্দী নয়, সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত। সেজন্য তাঁর বুদ্ধিচর্চা সমাজে মুক্তি প্রসারিত করতে পারেনি, সমাজ গিলে নিয়েছে বুদ্ধিসর্বস্ব ব্যক্তিটিকে, ব্যক্তি আপস করেছে কিংবা একঘরে হয়েছে, ঐ পথেই যুক্তিচর্চা, শেষ বিশ্লেষণে, পর্যবসিত হয়েছে আত্মরতিতে, উন্মাসিকতায়, অভিমানী বুদ্ধিতে। স্বকাল থেকে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, আলাপচারী করেছেন নিজেদের মধ্যে; দূরে থেকে গেছে তারা, যাদের বলা হয় জনসাধারণ, অজ্ঞতার তিমিরে। তার কারণ খুব সম্ভব বুদ্ধির মুক্তি-অভিযানে জনসাধারণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি।

বুদ্ধিচর্চা এবষ্ট্রাবট, মুক্তিও তাই, সেজন্যই কংক্রীট সময়, দেশের ওপর ঐ চর্চার অভিঘাত ক্ষীণ, মুক্তির বোধ অলীক। শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধিচর্চা সম্ভব, কিন্তু বুদ্ধিকে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়; কারণ কয়েদী সমাজে ব্যক্তি স্বাধীন নয়। সমাজের ফ্রেমে ব্যক্তির চলাফেরা, ব্যক্তির সব পথ ঘুরে ঘুরে সমাজে ফিরে আসে। কাজী আবদুল ওদুদের মানবিকতার বোধ, তার দরুন, ব্যক্তিনির্ভর, সমাজ নির্ভর নয়; ঐ খণ্ডিত মানবিক বোধ থেকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন স্বকাল, সবকিছু; মেলাতে চেষ্টা করেছেন সব বিপরীত যুক্তির মধ্যে; কিন্তু বিশ্লেষণে ফাঁক থেকে গেছে, বিপরীত যুক্তিতে অন্তরিত হয়নি, তখন তিনি প্রার্থনা করেছেন শুভবোধের, নিরঞ্জন-কল্যাণের, ঐ প্রার্থনা আকুল ও আন্তরিক, ঐ বিপরীত তাঁকে বারেবারে হানা দিয়ে ফিরেছে, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কতকগুলো এবষ্ট্রাবট বোধে, ঐ তাঁর কাছে ইতিহাস।

সেজন্য প্রতিতুলনার ঝোঁক তাঁকে মথিত করেছে, তিনি প্রতিতুলনা করেছেন তাঁর স্বকালের মুসলিম সমাজের সঙ্গে আব্বাসীয় যুগের মুতাজেলা মতবাদ ও গাজ্জালী-সংঘাতের। কিন্তু তাঁর স্বকাল তো আব্বাসীয় যুগ নয় এবং তাঁর কালের যুক্তি প্রত্যয় প্রয়োগ ব্যবহার ঐ যুগের মতো নয়।

প্রতিতুলনায় এবষ্ট্রাকশন বড়ো হয়ে দেখা দেয়, ঐ এবষ্ট্রাক্‌শনে কালপ্রত্যয় অনুপস্থিত, ব্যক্তি ভাবাশ্রয়ী হয়, তার বিচারপদ্ধতিতে কংক্রীট লুপ্ত হয়ে যায়। কাজী আবদুল ওদুদের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, প্রতিতুলনার ঝোঁক থেকে তিনি ইতিহাসের মুক্তির অন্তঃসার বেছে এনেছেন, ঐ অন্তঃসার বাস্তবসম্পর্করহিত, সেজন্য তাঁর ইতিহাসবোধে স্বকালের কংক্রীট চেহারা ধরা পড়েনি, তাঁর যুক্তিতে কংক্রীট মানুষ উদ্ভাসিত হয়নি, তাঁর বিচারে সমগ্রতার উন্মীলন ঘটেনি।

স্বকালকে তিনি বিচার করেছেন উনিশ শতকের একটি পর্ববিশেষের পটভূমিতে, তাঁর যুক্তির কাঠামো উৎসারিত হয়েছে ঐ পর্ববিশেষ থেকে, তাঁর বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্রে কাজ করেছে ঐ পর্বের কতিপয় ব্যক্তি। এভাবেই সব কিছু, ব্যক্তি, সময় তাঁর কাছে এবষ্ট্রাকশনে ধরা দিয়েছে, প্রতিতুলনার পথে ইতিহাসবোধ উন্মীলিত হয়েছে, যেন দু'দিক থেকে এবষ্ট্রাক্‌শনের দুই দেয়াল তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তিনি খুঁজেছেন ঐ দেয়ালের মধ্যে মুক্তির পথ, সেজন্য তাঁর বক্তব্য ফিরে এসেছে ধ্বনিত হয়ে তাঁর কাছে, ব্যক্তির কাছে, যে-ব্যক্তি বুদ্ধির নিশেন, যার চারপাশে অজ্ঞতার তিমির অফুরন্ত অনিঃশেষ। তিনি যে-ব্যক্তিতে বিশ্বাস করেছেন সেই ব্যক্তি শিক্ষিত আর শিক্ষিত ব্যক্তির আলাপচারী শিক্ষিতের সঙ্গে। জনসাধারণ? তারা আছে কোথাও, তাদের শেখানোর জন্যই ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের বুদ্ধিচর্চা করা। এ ভাবেই জনসাধারণের বোধ তাঁদের চেতনায় কংক্রীট অস্তিত্ব লাভ করেনি, তাঁদের নেতৃত্ব মানার জন্যই ত জনসাধারণের দরকার। মুক্তি গুটিকয় ব্যক্তির উপহার, সে-গুটিকয় ব্যক্তি হচ্ছে শিক্ষিত যুক্তিবাদী বুদ্ধিবিশ্বাসী। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন এভাবেই যুক্তিচর্চার এলিট ভূমিকা নির্ধারিত করেছে। ঐ নির্ধারণ সীমিত, খণ্ডিত; তার দরুন ঐ যুক্তি চর্চার মানব-প্রত্যয়, শেষ বিশ্লেষণে, শিক্ষিত ভদ্র সজ্জন ব্যক্তির প্রত্যয়, ঐ বুদ্ধিচর্চার ইতিহাসবোধ, শেষ বিশ্লেষণে, শিক্ষিত ভদ্র সজ্জন ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণে ব্যস্ত। মানুষ, মানবিকতা লুপ্ত, শুধু আছে ব্যক্তি, কাজী আবদুল ওদুদ তার দু'হাত ধরে যেন বাস্তবের দিকে তাকিয়ে, যে-বাস্তব স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন; তিনি একা, তাঁর মধ্যে নিঃশেষ নিঃসঙ্গতা, শেষহীন।

তাঁর আদর্শপুরুষ রামমোহন। রাজার যোগ্য শিষ্যের মতো তাঁকে তিনি যুক্তি দিয়ে বিচার করেছেন, ফের ভালোবেসেছেন শিষ্যের মতো।

রামমোহনের সাধনা যুক্তিবাদী, যুক্তির সাহায্যে তিনি শাস্ত্রের, জীবন-যাপনের, সমাজের নানা অজ্ঞতা দূর করেছেন, যুক্তিকে জীবনযাপনের উপকরণ হিসেবে ভেবেছেন, মানবকল্যাণবোধে উপনীত হয়েছেন। একজন ব্যক্তির অমন নানামুখী অভিযান কাজী আবদুল ওদুদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্যক্তির অমন সত্যঅভিমুখী নানা যাত্রা তাঁকে জিজ্ঞাসু করেছে, সেই জিজ্ঞাসাকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজে, সংস্কৃতিতে; স্বকালে কামাল পাশার মধ্যে দেখেছেন অমন উদ্যোগের ভিন্ন রূপ, অতীত ও বর্তমানের ঐ দুই পুরুষ-চরিত্র তাঁকে শিখিয়েছে সত্য ও কল্যাণের বোধ, যে-বোধের ভিত্তি যুক্তিবাদ, যে-যুক্তির মূলমন্ত্র: যা মানুষের কল্যাণকর নয় তা-ই মনুষ্যত্ববিরোধী।

কাজী আবদুল ওদুদের যুক্তিবাদনির্ভর মানবিকতা ঐ কারণেই উদার, ঐতিহাসিক ও ব্যক্তি-আশ্রয়ী। রামমোহনের ব্রাহ্ম আন্দোলন, কামাল পাশার নব্যতুর্কী অভিযান, কাজী আবদুল ওদুদের বুদ্ধির মুক্তি শ্লোগান ভাবনা-বেদনার তীব্রতা তৈরী করে, দুর্বার আবেশ সঞ্চার করে, কিন্তু বাস্তবে ক্ষয় হয়ে যায় বাস্তবের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে। সেজন্য তাঁর রচনা আত্মোপলব্ধির যাতনা, স্বীকারোক্তির দায়িত্বে ভারাতুর, তাঁর ধর্মপ্রবণ সত্য তৃষিত সত্তার সারাৎসার; কিংবা অভিমত, শুভেচ্ছা ও ভবিষ্যদ্বাণী; কিন্তু গভীর-তর অর্থে আন্দোলন নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বুদ্ধির ক্ষণিক উন্মাদনা ভেঙে যায়, কাজী আবদুল ওদুদ ফের ব্যক্তিতে ফিরে আসেন, এই বিশ্বাসে উপনীত হন যে, একালের বুদ্ধিজীবীদের অনেকের পক্ষপাত সংঘবদ্ধতা, অধিকারঘোষণা আর প্রচার-বহুলতার দিকেই—বিচার, প্রেম-প্রীতি, আত্ম-বিকাশেরদিকে নয়, তাঁর বুদ্ধির অভিজ্ঞতা এভাবেই রূপান্তরিত হল নিঃসঙ্গ অভিজ্ঞতায়, তিনি থেকে গেলেন একটি বিশুদ্ধ ও নির্মল চরিত্র হিসেবে।

আর এইভাবে, বুদ্ধিজীবীর বিষয়ে তিনি একটি ধারণা উপহার দিয়ে গেছেন। তিনি ব্যক্তি, সত্যের নিঃসঙ্গ যাত্রী, নিজের যুক্তির অনলে নিজেকে অবিরল তিনি দগ্ধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি উপহার দিয়েছেন প্রত্যক্ষ বিচারে আস্থা ও বিজ্ঞানবুদ্ধি। তিনি, কাজী আবদুল ওদুদ, শেষ পর্যন্ত, থেকে গেছেন চিন্ময় অভিজ্ঞতা হিসেবে, একজন সৎব্যক্তির প্রতীক হিসেবে, যিনি মুক্তির জন্য নিরন্তর সচেষ্ট।

সরল উদ্ভাসন : শওকত ওসমান

উপন্যাস, গল্প, নাটক এই তিন শিল্পরূপের মধ্যে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন শওকত ওসমান, উন্মীলিত করেছেন তাঁর বক্তব্য, যে-বক্তব্য স্পষ্ট, ঋজু, সরল। তাঁর বক্তব্য কৌতূহলে আক্রান্ত, বিভিন্ন ভাবে কর্মিষ্ঠ, তিনি শীতল নন, নিরঞ্জন নন, প্রখর ও প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত, দেশ ও কাল, সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তিনি উৎসুক। ঐ ঔৎসুক্যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা আছে, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আছে, ঐ সবই বাস্তব-উৎসারিত, যে-বাস্তব স্পর্শবহ, সেজন্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ ও সংঘাত সবকিছুই বাস্তবের তথ্যবহ। আর বাস্তবের অভিজ্ঞতা সচেতনভাবে জয় করে নিতে হয়। শওকত ওসমানকেও জয় করে নিতে হয়েছে বাস্তবকে; তাই প্রথম পর্যায়ের বিশদ, বিস্তারিত, উপাদানবহুল শওকত ওসমান দ্বিতীয় পর্যায়ে সংকেতভাষণে ব্যাপৃত। বাস্তবের তথ্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ বদলে যাওয়ার কারণ খুব সম্ভব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত। প্রথম পর্যায়ে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে প্রধানত সামাজিক অভিজ্ঞতা হিসেবে উদ্ভাসিত, তাই তিনি উপাদানবহুল, বিশদ, বিস্তারিত; দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে প্রবল ও প্রখরভাবে ব্যক্তিক ধ্যান-ধারণা-জাত, সেজন্য চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ, সংঘাতে তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ ভরে দিচেছন, তাই তাঁকে সংকেত-ভাষণে অভ্যস্ত হতে হচেছ, বক্তব্যনিষ্ঠ হতে হচেছ, গল্প ও উপন্যাসের সাহায্যে একটি বিশেষ বক্তব্যকে নিষ্কৃতি দিতে হচেছ, যেন তিনি বক্তব্যপীড়িত। সব সময়ই তিনি বক্তব্যনিষ্ঠ, কিন্তু প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তব্যের শিল্পরূপ ভিন্ন কেন?

প্রথম থেকেই শওকত ওসমানের কাছে উপন্যাস অথবা গল্প ভঙ্গিপ্রধান শিল্প নয়। উপন্যাস অথবা গল্প তাঁর কাছে জগৎসংসারের চিত্র আঁকার ও বোঝার মাধ্যম। প্রতীক নয়, বিরাট কোন ভাবও নয়, নিছক বাস্তবের আকর্ষণ তাঁর কাছে অপ্রতিরোধ্য, সেজন্য বাস্তবের অবিকল উদ্ভাসনে তাঁব ক্লান্তি নেই।

কারণ, বাস্তবের অবিকল উদ্ভাসন সমাজসংস্কারে কঠিন আঘাত হানে, অন্যায়-অবিচার নির্বাসন দেয়, এভাবেই শিল্পের সত্য ও সামাজিক ন্যায়বোধের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হয়, মিত্রতার উদ্ভব হয় স্বাভাবিকতাবাদের সঙ্গে বিপ্লবী চিত্তের। সমাজসংস্কারে শিল্পের সত্য মূল্যবান অস্ত্র এ বোধও হয় তো শিল্পীচিত্তে প্রেরণা উদ্দীপক। শওকত ওসমানের 'বনীআদম' ও 'জননী' উপন্যাসদ্বয় তারই নজির।

শিল্পের সত্য ও সমাজসত্য অভিন্ন, শওকত ওসমানের অমন ধারণা হয়ত বা বিতর্কমূলক। শিল্পের সত্যের সঙ্গে সামাজিক সত্যের সম্পর্ক বাস্তববাদ অথবা স্বাভাবিকতাবাদের পথে নির্ণীত হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিকতাবাদ কি বাস্তববাদ ? জগৎসংসারের অবিকল উদ্ভাসনের পরেও সমাজের গভীরতম মূলে যে-নিয়মের চিরন্তন ক্রিয়া চলছে তার হৃদস্পন্দন অনুভব করার একাগ্রতাই শিল্পে বাস্তববাদের উৎস। স্বাভাবিকতাবাদ জগৎসংসারের সামগ্রিক উদ্ভাসন নয়, বিশেষ একটি ধারার ওপর জোর দেয়, তাকে দৃশ্যমান করে তোলে, সেই সমাচারকে সত্যের আকার দেয়। বিশেষ কোন দূষণীয় নীতির অপসারণই যেন তার লক্ষ্য, সেজন্য নানা তথ্যের সংকলন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অবতারণা। কিন্তু বিশেষ একটি ধারার ওপর মনোনিবেশের দরুন বহু বিচিত্র জটিল ঘটনারাশির বিবরণ শেষ অবধি মনে হয় সরল রূপসী। 'জননী' কিংবা 'বনীআদম' উপন্যাসের অগাধ ঐশ্বর্য ও অমল বিশ্ব, অন্তিম বিশ্লেষণে, সরল এক অভিযান। উপন্যাসের শুরুতে যে-ব্যাপ্তির সূচনা, আস্তে আস্তে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে কোন একটি বিশেষ ছকের দিকে। ঘটনারাশি এগিয়ে গেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে, বুঝি প্রিয় কোন বক্তব্য কি মন্তব্য প্রতিষ্ঠায়। সেই বক্তব্যে লুকনো সংস্কারকের কণ্ঠ, বক্তব্যে অনুরণিত জগৎসংসারের অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে শপথের উচ্চারণ। কিন্তু তাতে কি স্পষ্ট জগৎসংসারের নিয়ম, বাস্তবের অন্তরঙ্গ জন্মান্তর ? শিল্পে বাস্তববাদ নিয়মের অভিসারী। তবে কি শিল্পে স্বাভাবিকতাবাদ জগৎসংসার সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংকলনের পর ঐ ঝোঁকের জন্যই শিল্পীর অজান্তে সমাজসংস্কারকের জন্ম দেয় ? বোধ হয় তাই।

প্রথম পর্যায়ের শওকত ওসমানকে মনে হয় স্বভাববাদী শিল্পী। তাঁর লক্ষ্য সমাজসংস্কার, বাস্তবের নিয়ম আবিষ্কার নয়, সেজন্য তাঁর বিপ্লবচিত্ততা সংস্কারেরই ছদ্মবেশ। বাস্তবের অবিকল উদ্ভাসনে যে-অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে, তার গুণেই উপন্যাস দু'টি মন হরণ করা সত্ত্বেও প্রশ্ন তোলে স্বভাববাদী

চিত্ত সম্বন্ধে। কেন বিশেষ ঝোঁক ? কেন ঘটনারাশি সংস্কারবের চোখে অবলোকন করা ? চিরকালের সত্য এসব : দু:খ-দারিদ্র্যের সংসারে মন নষ্ট হয়, অবিচারের জন্ম হয়, হতাশা ও নির্জীবতার অধীন হয় সুস্থ সবল মানুষ-মানুষী। সেই চিরকালের সত্য রূপ নিয়েছে 'জননী'তে, 'বনী আদমে'; উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলাদেশের চাষী মজুর জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস দু'টিতে দেখা মেলে তাই আজহারের মতো মানুষের, যার ধমনীতে অতীত গৌরবের স্মৃতি, সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়নের স্বপ্ন যার চোখে, কিন্তু ঠিক পথ জানে না, তাই সব প্রয়াসই বারবার ভুল হয়ে যায়, দাম্পত্যজীবনে দেখা দেয় ভুল-বোঝাবুঝি অশান্তি; দরিয়া বিবির হাজার অনটনে সংসার টিকিয়ে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস, স্বামীর মৃত্যুর পর দু:খে-দারিদ্র্যে আস্তে আস্তে নিজের অজান্তে প্রলোভনের শিকারে পরিণত হওয়ার বিবরণ, চন্দ্রকোটালের মতো আত্মভোলা গান-পাগল চাষীর মানসিক অবক্ষয়ের ইতিহাস; হারিসের মতো দিনমজুরের চোখে শহরের বহুমাত্রিক উদ্ভাসন, তার যন্ত্রণা, স্মৃতি, স্বপ্ন, আশা, হতাশা, সবকিছুই বিস্তারিত, সবকিছুই উপাদানবহুল যেন রুদ্ধশ্বাস কাহিনী, যেন বা চেনাজানা বাস্তবে তৃতীয় আয়তনের বিস্তার, কিন্তু সেই তখনই দেখা দেয় বাস্তবের বিচ্ছেদ, স্বপ্নের অভাব, স্মৃতির ছলনা; পরিকল্পিত পরিণতিতে বাস্তব আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বাস্তব কি পরিকল্পনার অধীন ? কিংবা জীবনের কলস্বর কি শিল্পীর আজ্ঞা মেনে চলে ? উত্তর অফুরান; শিল্পীকে কোথাও থামতে হয়, তখন তিনি অকস্মাৎ অসহায়, বাস্তবের মালমশলা শিল্পের অঞ্জলি হয়ে রূপ নেয়,, তখন তাঁকে বলতে হয় : এভাবেই আমি শেষ চাই। ঐ বলা প্রথম থেকে বাস্তবে লিপ্ত নয়, জীবনের অগাধ ঐশ্বর্যে হঠাৎ অভাব দেখা দেয়, জীবনের বিস্তারে টান পড়ে, অতৃপ্তির মধ্যে স্বভাববাদী শিল্প পরিণতি পায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শওকত ওসমান নিজেই সচেতন হয়ে উঠলেন স্বাভাবিকতাবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। কিন্তু স্বাভাবিকতাবাদ তাঁর মধ্যে সমাজসংস্কারকের জন্ম দিয়েছে, আর সমাজসংস্কারকের ন্যায়-নীতি-সত্য সম্বন্ধে বক্তব্য থাকেই। অন্যপক্ষে এই পর্যায়ে বাস্তবরোধ তাঁর ব্যক্তিক ধ্যানধারণা থেকে উৎসারিত। পূর্বপর্যায়ে বক্তব্য এসেছে বাস্তবের উপাদানবহুল বিশদ বিস্তার থেকে, তাই রচনায় সংস্কারকের ঝোঁক সত্ত্বেও বাস্তবের উদ্ভাবন অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এনে দিয়েছে। উত্তরপর্যায়ে বাস্তব বক্তব্যধর্মী, কিংবা ব্যক্তিগত ধ্যাণধারণাজাত বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই বাস্তবের অমন তত্ত্বমূলক রূপান্তরণ শওকত ওসমানের শিল্পকর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার

করেছে। 'ক্রীতদাসের হাসি' কিংবা 'রাজা উপাখ্যান' তারই প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। ঐ রীতির লাবণ্যসার 'ক্রীতদাসের হাসি' গ্রন্থে, এবং গ্রন্থটির বক্তব্য মহান ও বিশাল। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে খাঁচায় পোরা যায় না, সে প্রলোভনের পরপারে, সে জয়ী, সবীজ তার বেদনা কেবলি ঝরে ঝরে পড়ে আশার শাশ্বত গান করে, এই বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন দেশকালসময়, অন্য অর্থে চিরকাল, কিন্তু অমন বক্তব্যের শিল্পরূপ কৃশ, তাই সবকিছু বর্জন ঘটনা ও কাহিনীর কাঠামো রেখে, তাই সংলাপ ও সংঘাতে এসেছে তত্ত্বের কূটাভাস ; বক্তব্যের সঙ্গে অনবরত লিপ্ত থাকার দরুণ ভাষায় এসেছে অসহনীয় তীক্ষ্ণতা, বক্তব্যকে জনস্পর্শী করার ইচ্ছা থেকে এসেছে ব্যঙ্গের বদলে রসিকতা।

কি করে অমন হল? কোন কোন উপন্যাসের বক্তব্য খুবই মহান। সমকালীন জীবন জিজ্ঞাসার পটভূমিতে অমন বক্তব্য বেঁচে থাকার উপাদান যোগায়। তার দরুণ নিছক সাহিত্য পরিসরের বাইরে বক্তব্যের ব্যাপ্তি, যেন জীবনের অর্থ তাতে লুকনো, সেই সঙ্গে অশুভ অসুন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অস্ত্রও। সেজন্য বক্তব্যের মহত্ত্ব হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য, যে-মাধ্যমে ঐ বক্তব্যের উপঢৌকন সেই শিল্পও যেন বক্তব্যের মহত্ত্বে আচ্ছন্ন। 'ক্রীতদাসের হাসি' ঐ জাতের উপন্যাস। হাসি কি কেনা যায়? কেনা যায় কি আত্মাকে? জোর করে কিংবা অর্থ দিয়ে? আত্মা অনেক বড়ো, ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে, ঐ সত্য উজ্জ্বল এক নক্ষত্রের মতো উদ্ভাসিত উপন্যাসটিতে। সত্যের ঐ গভীর দ্যোতনা সমকালীন জীবনজিজ্ঞাসার পটে ছড়িয়ে যায়, সমকালীন রাষ্ট্র কিংবা অর্থ-নৈতিক অথবা সামাজিক অবস্থা বিদ্যুতের মতো মনে জেগে ওঠে, বক্তব্যের পরম ব্যঞ্জনায় অভিভূত হতেই হয়। ঐ অভিজ্ঞতা একপক্ষে সমকালীন চেতনার সারাৎসার, অন্যপক্ষে সত্যের প্রতি দায়িত্বশীল সাহিত্যের ইঙ্গিত-বহ। অন্যপক্ষে অমন বক্তব্যের একাধিক স্তর কিংবা একাধিক প্রয়োজন থাকার দরুন সাহিত্যবিচার খুব সম্ভব দ্বিধান্বিত। কিন্তু বক্তব্যের একাধিক স্তর কেন কিংবা একাধিক প্রয়োজন? হাসি অর্থ অথবা শক্তির ক্রয় অসাধ্য, ঐ বক্তব্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন বিভিন্ন। অমন দুর্নিবার স্বীকৃতি ও ব্যবহার জীবনের ক্ষেত্রে বক্তব্যটিকে করে তোলে সত্যের মতো অমোঘ ও অস্ত্রের মতো শাণিত। অমোঘ, কারণ বক্তব্যটিতে অন্তরিত চিরকালীন সত্য। শাণিত, কারণ বক্তব্যটির ভিত্তি

ঔচিত্যজ্ঞান। শওকত ওসমানের সার্থকতা এক্ষেত্রে, স্বাধীন মানবিকতার ক্লান্তিহীন জয়ধ্বনি তোলার জন্য। সমকালীন জীবনের তমোময়তার বিরুদ্ধে তিনি যেন প্রতিবাদ; উজ্জ্বল, ঋজু, স্মরণীয় তাঁর ঘোষণা : মানুষের আত্মা কেনা যায় না, যেন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

কিন্তু নিছক বক্তব্যই কি উপন্যাসকে শিল্পশোভন করে? খুব সম্ভব নয়। 'ক্রীতদাসের হাসির' ব্যর্থতা এখানেই। বই পড়া শেষ বলে বক্তব্যের মহান অভিঘাতে আচ্ছন্ন হতে হয়, সমকালীন জীবনে বক্তব্যটির বিশাল প্রয়োজনবোধ অভিভূত করে তোলে, কিন্তু ঐ অভিভূত ও আচ্ছন্ন অবস্থার অবসান হলে মনে জাগে নানা প্রশ্ন, ঘটনাবলী গেঁথে তোলা ও নির্মিতি কেন্দ্র করে। এক হিসেবে নির্মিতিই শিল্প, অভিজ্ঞতার, ঘটনার, চেতনার। নির্মাণেই অভিজ্ঞতার কাঠামো প্রত্যক্ষ হয়, ঘটনার বর্ণন বিবৃতির পর-পারে পৌঁছোয়, চেতনার সুক্ষ্ম ও জটিল বোধে উদ্ভাসিত হয় অস্তিত্বের অপার রহস্য। অন্যপক্ষে নির্মাণেই বক্তব্যের রূপান্তর, নির্মাণের মাধ্যমেই বক্তব্য হয়ে উঠে অভিজ্ঞতার অংশভাক, ঘটনায় প্রোজ্জ্বল করে বর্ধিত দীপ্তি, চেতনায় ছড়িয়ে দেয় অপক্ষপাত আলোকবৃষ্টি। বক্তব্য, অভিজ্ঞতা, ঘটনা, চেতনায় মিলে মিশে নতুন সত্তা লাভ করে; বক্তব্যের ঐ পরিবর্তন সাহিত্যের লক্ষ্য, সূক্ষ্ম ও জটিল ঐ পরিবর্তন শিল্পের স্বায়ত্তশাসনের নিয়ম মেনে চলে। উপাদান বিশাল বিচিত্র জীবনের, শিল্পে তার ব্যবহার সীমিত, নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত।

জীবন-উপাদানের শিল্পের স্বায়ত্তশাসনে পরিবর্তনের যথার্থতা খুব সম্ভব শওকত ওসমান মানেন না। তার দরুন জীবনের মতোই ঘটনা পরম্পরা তিনি ব্যবহার করেছেন যোগসূত্র শিথিল করে। কিংবা এও হতে পারে যে, বিশেষ একটি বক্তব্যের উদ্ভাসন তাঁর লক্ষ্য হওয়ার দরুন ঘটনাপরম্পরা তিনি ইচ্ছা করেই শিথিল করে দিয়েছেন। আত্মার অবমাননা ও আত্মার জয় সব যুগেরই ঘটনা, চিরকালীন ঐ ঘটনায় কালপরম্পরা তাই আবশ্যক, আরব্য উপনাসের জগৎ ও বর্তমানকালের ব্যবধান তাই যুগান্তরের নয়। এই ভেবেই কি শওকত ওসমান উপন্যাসের শুরুতে যে-ঘটনাটি গেঁথে দিয়েছেন যার ভাষ্য মূল কাহিনীর মধ্যে লুকনো, যে-ঘটনার ভিন্নতর বিন্যাস আলেফলায়লার জগতে উন্মোচিত? যদি তা-ই হয় ত'াহলে একটি মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ঘটনা আবর্তিত হয় মাত্র। চরিত্রের বিকাশ এক্ষেত্রে খণ্ডিত, বক্তব্যের প্রয়োজনেই তাদের আবির্ভাব। নায়কের চলন্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেদিয়ে বক্তব্য বেড়ে ওঠেনি,

বক্তব্য যেন পূর্বথেকেই চরিত্রদের জানা; হারুণ-অর-রশিদ, কবি কিংবা ক্রীতদাস নিজেদের ভূমিকা থেকে ঐ বক্তব্যের বিন্যাস যেন সন্ধান করে ফিরছে। ফলে চরিত্রদের পরিবর্তিত ব্যবহার থেকে জীবনদর্শনের কোন নতুন সঞ্চয়, সংজ্ঞা কিংবা প্রতিজ্ঞার খোঁজ মেলে না। অন্য অর্থে শওকত ওসমানের মানববোধ বিষয়নির্বাচন ও মতামতেই প্রায় নিঃশেষিত, তাঁর কাহিনীর কাঠামোয় শুদ্ধ হওয়ার অবকাশ পায় নি। অবশ্য তাঁর পক্ষে যুক্তি আছে। সে হচ্ছে: নিছক গল্প বলা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ব্যবহার করে বক্তব্যের আভ্যন্তরীণ দিকগুলি তিনি পরিস্ফুট করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। চরিত্র ও চরিত্র-স্রষ্টা ঔপন্যাসিকের মধ্যে দূরত্ব তাই অবসিত, মানুষের বিচিত্র ব্যবহারের মধ্যেকার ছন্দ প্রায় ক্ষীণ, মতামতের প্রাধান্য, চরিত্রের ওপর তার আরোপ, এ সবই প্রমাণ করে বক্তব্য সম্পর্কে শওকত ওসমানের একনিষ্ঠতা। কিন্তু নিছক বক্তব্যের বাঁধনকে কি ধৃতি বলা সম্ভব? না বোধ হয়। সেজন্য অতুলনীয় কলাকৌশল সত্বেও গোটা উপন্যাসটা মনে হয় উদ্যমের ব্যথা সহ্য করেছে। উদ্যমের ব্যথা, কারণ, প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে বক্তব্য তিনি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন, কিন্তু সব উদ্যমই খণ্ডিত করেছে চরিত্রের অপরিণতি, তার আবেগে বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চিৎকার নেই, বুঝি ক্রীতদাসটি প্রথমে বেগম জুবায়দার ও পরে সম্রাটের পরীক্ষার খোরাক হিসেবেই থেকে গেল, সে যেন লিপ্ত নয় জীবনে কিংবা ঘটনায়, তার অবস্থান জুয়ো হিসেবে, তাকে নিয়ে বাজী খেলেছে সম্রাট ও কবি, সেজন্য তার অন্তিম উচ্চারণে মহৎ বিদ্রোহের ঘোষণা সত্বেও তাতে অঙ্কিত নয় তার ইচ্ছাশক্তি, সে মৃত্যুর মুহূর্তেও অন্যের। দাসত্বের ঐ মৌল বিরোধের সমান্তরালে যাদের চরিত্রায়ন তারাও স্বাধীন নয়, ঔপন্যাসিকের আত্মোপলব্ধির বাহন মাত্র, দুঃশাসন বিশ্বের বুকে ক্রীতদাসের অন্তিম উচ্চারণ ঘটনা থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেয়া সম্ভব, ঐ উচ্চারণ কারো নয়, কোন চরিত্রের নয়, ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের আত্মোপলব্ধি, তাঁর মনের প্রয়াস-প্রসূত উদ্বর্তন। ঐ উচ্চারণটির জন্যই ঘটনাগুলি গেঁথে তোলা, ঐ উচ্চারণে অন্তরিত স্বাধীন মানবিকতার সঙ্কল্প। ঐ আত্মোপলব্ধি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু।

ঐ আত্মোপলব্ধি তাঁকে ফের ব্যঙ্গপ্রবণ, রসিকজন করে তোলে। সমাজ-সময় থেকে প্রহৃত হওয়ার দরুনই বোধ হয় শওকত ওসমান স্পষ্ট, ঋজু, কখনো বা মোটা কথায় বক্তব্য তুলে ধরেন, যেন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই বিন্দু বিন্দু করে ক্ষরিত করেন তাঁর চিত্ত, আর সেই তত্ত্ব হচ্ছে মানবধর্মে বিশ্বাস। ঐ

বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ ঘটে, সেজন্য তাঁর ব্যঙ্গ, রসিকতা, হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্য সমাজ, ব্যক্তি কিংবা ঘটনা। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু ব্যঙ্গ কেন তরল, রসিকতা কেন মেঠো, হাসিঠাট্টা কেন সুড়সুড়ি মাত্র? কেন অমন হয়? হয় তো তার কারণ বাংলাসাহিত্যে হাসির ঐতিহ্য এবং বক্তব্যপ্রবণ শওকত-ওসমানের চিত্ত। বাংলা সাহিত্যে হাসির ঐতিহ্যে ভাঁড়ামীর অংশ বলীয়ান। গ্রামীণ মানসিকতার জের তার একটা কারণ নিশ্চয়ই। তার দরুন হাসি কিংবা রসিকতা ঘটনা কিংবা চরিত্রের উদ্ভটতা উন্মোচিত করে না, কোন কিছুর ঢাকনা খুলে ধরে না, শুধু জোর দেয় বৈসাদৃশ্যের ওপর। হাসির সম্ভাবনা নির্ভর করে গণমানসে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার আভ্যন্তরীণ কতক বিশ্বাসের ওপর। ঐ স্থায়িত্ব তুষ্টি ও উদ্ভটতা তৈরী করে ও সহ্য করে, মানুষ হেসে তাই নির্মল হয়। অনিশ্চয়তা দেখা দিলে স্থানিক রসিকতা হারিয়ে যায়, ব্যঙ্গের ঝোঁক প্রবল হয়, কমিক পরিস্থিতি বানাতে হয় এবং বানানো পরিস্থিতিতে হাসির অনিঃশেষ উর্বরতার অবসান ঘটে। ঐ কারণেই শওকত ওসমানে হাসির চেয়ে ব্যঙ্গ বেশী এবং তাঁর ব্যঙ্গ তরল। তার নানা নজির ছড়ানো উপন্যাসে, গল্পে, 'নেত্রপথে', 'উভশৃঙ্গে'। যেখানে তিনি সংযত সেখানে তাঁর বক্তব্য শাণিত, অনিবার্য; যেখানে তিনি শিথিল সেখানে তাঁর অসাধ্য কিছু নেই।

তাঁর চিত্তের ভিত্তিভূমিতে আছে মানবধর্মে বিশ্বাস। ঐ বিশ্বাসের খোঁজে তিনি বাস্তবকে আক্রমণ করেছেন সাহিত্যিক যাত্রার শুরু থেকেই। প্রথম পর্যায়ে তাঁর বাস্তববোধ হৃদয়সঞ্জাত,' 'পিঁজরাপোল,' 'সাবেক কাহিনী,' 'জুনু আপা'র গল্পের বাস্তব তাই ভাসাভাসা; দ্বিতীয় পর্যায়ে শওকত ওসমান সচেতন হলেন ঐ অভাব সম্বন্ধে, কিন্তু বাস্তবের গভীরে নিয়মের যে-চিরন্তন ক্রিয়া চলছে তাকে মুষ্টিবদ্ধ না করে তিনি তত্ত্বমূলক বক্তব্য তীব্র, প্রখর করে তুললেন, সৃষ্টি করলেন 'প্রস্তরফলকের' মত্যো গ্রন্থ, যেখানে নিজেকে নিঃসৃত করলেন বক্তব্য প্রতিষ্ঠায়, কিন্তু বাস্তবের তথ্য, ঘ্রাণ, স্পর্শ স্মৃতির মতো সুদূরে থেকে গেলো।

শিল্পকর্মে বক্তব্য নিশ্চয়ই অন্তরিত, কিন্তু বক্তব্য সোচ্চার হয়ে উঠলে শিল্পরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পকে জখম করে বক্তব্য বেড়ে ওঠে। মানবধর্মের কল্যাণের জন্য যদি শিল্পরূপ জখম হয়, বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কখনো স্থূলকে, তরল হতে হয়, তা-ও জরুরী, শওকত ওসমানের তা-ই উত্তর।

শিল্পী ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি, অন্তিম বিশ্লেষণে, এক অনন্ত সংলাপ; এ সংলাপ লোকজ ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিকের, রাষ্ট্রের সঙ্গে মুক্তচিন্তার, সংরক্ষণের সঙ্গে পরীক্ষার। এ সংলাপ থেকে শিল্পী শেখে তার ভাষা, তার সত্য, তার চেতনার স্বরূপ। সেজন্য শিল্পীর ভাষা কিংবা সত্য অথবা তার চেতনা তার একার নিজস্ব নয়, সংলাপের স্পর্শে তার মন খোলে, সে পক্ষ-বিপক্ষ চিনে নেয়, কিংবা পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে দিশা খোঁজে, দিশা হারায়। ঐ সংস্পর্শ দেয় তাকে উদ্দীপনার মুহূর্ত, আবিষ্কারের আনন্দ, গুপ্ত সংযোগ ও সাদৃশ্য, তার আশা তাই পরাক্রান্তও প্রতিধ্বনিময়, তার হতাশা অপ্রতিরোধ্য ও মারাত্মক, তার সন্ধি স্থাপন নিয়মের অন্য অধীন।

তার চেতনায় ঐতিহ্যের উদ্বোধন তাই সাম্প্রতিকের সংশ্রব ও সমস্যা থেকে, তার অতীত আবিষ্কার আত্মআবিষ্কারের সমান্তর, তার সাম্প্রতিকে যোগ আত্ম-আবিষ্কারের জন্যই। নিজেকে নিত্য পরিশোধন, প্রবহমান করার জন্যই তার সবকিছুর ব্যবহার; স্বদেশ, স্বকাল, দর্শন, রাজনীতি, সবকিছুই। স্বদেশের স্বকালের ব্যবহার বিশ্বপরিক্রমার একদিক; বিশ্বপরিক্রমার জলবায়ু স্বদেশে স্বকালে আলোক ও রৌদ্র, ঐ বোধ তাকে বাঁচায়, নিরন্তর চিন্তাবয়নে সক্ষম রাখে। শিল্পীর কাছে এ পথেই ঐতিহ্য ধরা দেয়। ঐতিহ্য দুই পটভূমিতে বিন্যস্ত। এক পটভূমিতে আছে ব্যক্তির লোকজ উৎস, পরম্পরা, ইতিহাস; অন্য পটভূমিতে আছে ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়াজনিত দেশোত্তর মনোভাব; ঐ দুই পরস্পরে প্রবিষ্ট, পরস্পরকে বর্ধিত ও রঞ্জিত করে। দ্বন্দ্বের উৎস সমাজই, কিন্তু দ্বন্দ্বের উত্তরণ ব্যক্তিক ক্ষমতার মাপে, ঐ মাপ ক্ষমতা ও প্রতিভার যোগবিয়োগের অধীন।

ব্যক্তিক ক্ষমতা ও প্রতিভা নিরঙ্কুশ নয়। ক্ষমতার সীমা সংস্কৃতি-নির্ধারিত, প্রতিভার বিকাশ সংস্কৃতির অন্য নিয়মের অধীন। সংস্কৃতির অতীত পরম্পরা

ও সাম্প্রতিক জলবায়ু ও পরীক্ষানিরীক্ষা ব্যক্তিক ক্ষমতা চিহ্নিত করে, সেজন্য ব্যক্তির কাজ সংস্কৃতির বৃহত্তর পট ও শিল্পমাধ্যমের বিশেষ পটের ভিত্তিতে; সংস্কৃতির বৃহত্তর পটে তার মানস নিরূপিত ও শিল্পমাধ্যমের বিশেষ পটে ঐ মানস সমন্বিত করে চেতনা ও আবেগ এক অনন্য গুচ্ছে। সংস্কৃতির বৃহত্তর পটের নিয়মে শিল্পমাধ্যমের বিশেষ পট তৈরী হয় না, তার দরুন শিল্পমাধ্যমের বিশেষ পট প্রতিভাত হয় স্বায়ত্তশাসিত বলে।

স্বায়ত্তশাসনের প্রতি আসক্তি ব্যক্তির অমোঘ, বুঝি ব্যক্তিতৃষিত ঐ স্বায়ত্তশাসনের জন্য, ঐ তৃষ্ণা চিহ্নিত করে ব্যক্তিক ঝোঁক, ব্যক্তি হয়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসিত। ব্যক্তির কিংবা শিল্পমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসনে লুকানো প্রতারক এক সরলতা, ঐ সরল দর্পণ লুপ্ত করে আবহ, শুধু দেখা যায় নিজেকে, ব্যক্তিকে, শিল্পীকে, একা। কিন্তু শিল্পমাধ্যমের নিয়ম আঙ্গিকের, ব্যবহারের, উদ্ভাবনের; ঐ আঙ্গিক, ব্যবহার, উদ্ভাবন শিল্পমাধ্যমের পরম্পরা মেনে চলে; কিন্তু ব্যক্তিক মেজাজ, ঝোঁক, মনোভঙ্গির উৎসে আছে সংস্কৃতির বৃহত্তর পট, ঐ সবের অভিঘাত ব্যক্তির ওপর প্রবল ও বলীয়ান, ঐ পথেই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আঙ্গিকের ইতিহাস শিল্পমাধ্যমের ইতিহাস, সংস্কৃতির বৃহত্তর পটের ওপর তার প্রভাব পরোক্ষ, সেজন্য সংস্কৃতির বৃহত্তর পটের নিরঙ্কুশ নিয়মাধীন নয় আঙ্গিকের ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের ভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি তার মেজাজ, ঝোঁক, মনোভঙ্গির মধ্যদিয়ে শোধন করে। ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন কিংবা শিল্পমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ব্যক্তির স্বাধীনতা নির্দিষ্ট করে, তাকে স্বাধীন করে না।

ব্যক্তি কিংবা শিল্পমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন জরুরী, কারণ ঐ স্বায়ত্তশাসনে অন্তরিত পরীক্ষানিরীক্ষা, ভাবনাবেদনা, ঐ স্বায়ত্তশাসন ব্যক্তি ও মাধ্যমের পরস্পর দ্বৈরথযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী ও নির্দিষ্ট করে, ঐ ক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তব, স্মৃতি, ঘটনা, দর্শনের ব্যবহার তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়, ব্যক্তি তার মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়, এক শাশ্বত ও সঞ্জীবনী উৎকণ্ঠায় উৎসর্গীকৃত হয়। তৈরী হয় মূল্যবোধ, শিল্পের কিংবা ব্যক্তির, কারণ দুই-ই একাত্মক, ব্যক্তি তখন সর্বনাশ-চিহ্নিত চতুর্দিকে শিল্পের জন্য উৎকণ্ঠায়, বিশ্বাসে উৎসারিত হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে ঐ স্বায়ত্তশাসন নৈতিক ও মানসিক সততাকে অটুট রাখে, ডিক্টেটরী হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজনির্ভর। তার দরুন শিল্পের স্বায়ত্তশাসন সামাজিক, যে-সমাজ যতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেয় ততটুকু তার সীমা। সীমার ব্যবহার

ব্যক্তিকে চেতন করে, তাকে স্বাধীন করে না। ঐ চেতনার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা কিংবা যন্ত্রণা, আর্তি অথবা উৎকণ্ঠ আশা শিল্পমাধ্যমে সঞ্চারিত হয়, মাধ্যমে নির্বাচিত হয় চেতনার বিশৃঙ্খল ঝোঁক। ঐনির্বাচনই শিল্প, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব।

বাস্তব অন্য, যুক্তি ও তথ্যাবলীর ভাষায় যে-বাস্তব বিধৃত, বাস্তব তার চেয়ে অধিকতর কিছু। দ্বান্দ্বিক চিন্তন ও ভাষার এখানেই আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র। শব্দের ওপর সাংসারিক বাস্তবিক তথ্যাবলীর ক্ষমতা অসীম, যারা জীবনযাপনে প্রতিষ্ঠিত তারা তথ্যাবলী থেকে সুবিধা পেয়ে থাকে, তাদের ভাষার বদলে ভিন্নতর অন্যতর ভাষায় শিল্পী কথা বলে। তথ্যাবলীর ক্ষমতার ঝোঁক সর্বগ্রাসী, ঐ ঝোঁকে বিরোধের অবলোপ ঘটে থাকে, সংলাপের সার্বিক বিশ্বব্যাখ্যান লুপ্ত হয়, সেজন্যই জীবনযাপনে স্বার্থসংরক্ষণকারীদের কাছে বিপরীত ভাষায় কথা বলার প্রয়াস প্রতিভাত হয় অযৌক্তিক, রহস্যময় ও কৃত্রিম বলে। যথার্থ ভাষাসন্ধানের মূলসূত্র হচ্ছে: প্রত্যাখ্যান, যা চলতি, গতানুগতিক, প্রতিষ্ঠিত তার প্রত্যাখ্যান। ঐ ভাষায় শব্দ কোন বিষয়ের প্রকাশ নয়, বরং ঐ বিষয়ের অনুপস্থিতির নিনাদ। যার অস্তিত্ব নেই তাকে জীবনদান করা যথার্থ ভাষার কাজ। অনুপস্থিতকে উপস্থিত করে ভাষা, কারণ সত্যের বিশাল অংশ ঐ অনুপস্থিতের গোপনে রহস্যের আড়ালে নিহিত।

শিল্পী এভাবেই ভাষার খোঁজ করে থাকে। তাই তার কাছে পাতা ঝরে যায় সবুজ থেকে, আপেলের আকার নিয়ে তার ভাবনার অন্ত থাকে না, আপেল কখনো তার কাছে মদির গোলাকৃতি, তরুণীর স্তন কিংবা নিতম্ব; কিন্তু তার মনে জাগে: দংশিত, কর্তিত আপেলের আকার কি তাই ? তার দরুণ যে-বাস্তবে সব যুক্তি ও বাক্য মিথ্যা সেই বাস্তব শোধনের জন্য বিপরীত ভাষা একান্ত দরকার।

দ্বান্দ্বিক যুক্তি সৃষ্টিশীল যুক্তি: ঐ যুক্তিতে চিন্তার রীতি ও বস্তু উন্মোচিত, ঐ উন্মোচন ব্যবহার বিধিবদ্ধ নক্সার পরপারে। দ্বান্দ্বিক যুক্তি প্রতিভাত, দৃশ্যমান বস্তু তৈরী করে না। দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ মাত্র তাদের সমাবেশ ও ক্রিয়াশীল করে; ঐ বিশ্লেষণ পুনরুদ্ধার করে অর্থের নিষিদ্ধ ভূভাগ এবং এভাবেই প্রতিভাত করে সংস্কার কিংবা গতানুগতিকের বদলে মুক্তি। সংলাপের প্রতিষ্ঠিত রীতির ফ্রেম-বন্ধনময় এই বাস্তব, সেজন্য দ্বান্দ্বিক চিন্তন স্বভাবতই ধ্বংসশীল, সেইসঙ্গে মুক্তিরও। শিল্পের স্বায়ত্তশাসনে ঐ সত্য উন্মীলিত। শিল্পী এভাবেই বাস্তব পেরিয়ে যায়, বিধিবদ্ধ ভাষার নক্সা

পেরিয়ে যায়, অনুপস্থিতকে হাজির করায়। আর অনুপস্থিত হচ্ছে অনুভূতির ফ্রেমে নির্যাতিত ভাষা, শব্দ, ভাবনা।

মাধ্যমের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা, ঐ দুই পরস্পর-বিরোধী নয়। বরং দুই-ই পরস্পরে প্রবিষ্ট, পরস্পরের জন্য তৃষিত। ঐ স্বায়ত্ত-শাসনের অবলোপ, ঐ স্বাধীনতা হরণ ব্যক্তিকে শিল্পী হিসেবে পঙ্গু ও ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে দাস করে তোলে। অথচ ব্যক্তি ও সংস্কৃতির সংলাপের মধ্যে দিয়ে মানুষের মুক্তি এগিয়ে আসে। স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের বশ্যতা ও স্বাধীন চিন্তার মনোভাব গভীর ও মৌলিক অভিঘাত ছড়ায় মাধ্যম ও ব্যক্তিতে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি ও ব্যক্তির ঐ সংলাপ তার সমাজ ও ইতিহাসে ধ্বনিত। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বাংলা সংস্কৃতির তিন প্রধান পুরুষ সাহিত্যের আঙ্গিকে পরিবর্তন এনেছেন, সেই সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন অনিবার্য করে তুলেছেন। মাইকেল ভাষাক্ষেত্রে কথন ছন্দ, দেশজ বাক্‌ভঙ্গি ধ্বনিত করেছেন তাঁর বিড়ম্বিত সংস্কৃতপণা সত্ত্বেও। তিনি গদ্য ও কবিতার আঙ্গিকের অভ্যন্তরে গভীর এক পরিবর্তন অমোঘ করেছেন। দেশজ কথন ছন্দ, বাকভঙ্গি, স্মৃতি তিনি ব্যবহার করে আঙ্গিককে মুক্তি দিয়েছেন কৃত্রিম ভাষা, খণ্ডিত দরবারী ঐতিহ্য, একপেশে জাতীয়তা থেকে। অন্যপক্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি এনেছেন বিশ্বমানবিক মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে রক্ষণশীল যুক্তিনিষ্ঠতা থেকে উদ্ধার করেছেন, শৃঙ্খলা ও যুক্তিনির্ভরতার মধ্যে প্রবহমান করেছেন ভিন্ন প্রবল গুণ, এক অনিঃশেষ লাবণ্য তাঁর ভাষা-ব্যবহারে দীপ্ত; ইঙ্গিতময়তা, অন্তরঙ্গতা, বহুস্তর দ্যোতনা, বর্ণিলতা, সূক্ষ্ম স্পন্দন তাঁর ভাষাকে মানুষের বিশাল বিচিত্র গভীর বাক্‌রীতির কাছে এনেছে। সংস্কৃতিক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তার সংশয়, যন্ত্রণার সঙ্গে মিলিয়েছেন মানবানুভূতি। নজরুল ভাষাক্ষেত্রে উৎসারিত করেছেন এনার্কো-রোমাণ্টিসিজম, তাঁর ভাষায় মূর্ত হয়েছে ছিন্ন কল্পনা, বিচিত্র ছায়ামূর্তি, আবেগের বিশৃঙ্খলা, ভাষার আরেক নক্সা উন্মোচিত হয়েছে এভাবে। তিনি শিখিয়েছেন মানুষের অনুকরণ করতে, অন্য কিছুর নয়, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঐ মনোভাব জন্ম দিয়েছে উদ্দামতার, ক্ষিপ্রতার।

এভাবেই তাঁরা আঙ্গিক ক্ষেত্রে এনেছেন স্বীকৃত-রীতির বিপরীতে পরীক্ষা করবার মনোভাব, সংস্কৃতিক্ষেত্রে বশ্যতার বিপরীতে স্বাধীন চিন্তার মনোভাব। ঐ দুই মনোভাব আঙ্গিক ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে মানুষের মর্যাদা ও ভাষার মূল্য বারেবারে উদ্ধার করেছে, মানুষকে স্বাধীনতার পথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা

সংস্কৃতি মানুষকে স্বাধীন হতে শেখায়। সমাজের বাসিন্দা মানুষের আকাঙ্ক্ষা, নিয়তি, সংগ্রামের মধ্যে ঐ বোধ অবিরল কাজ করে, তার অন্তস্তলে উদ্ভাসিত হতে থাকে। স্বাধীনতা যেন আহ্বান, কিংবা চিৎকার, কিংবা আশা উদ্যম; ঐ সবের পরতে পরতে জড়িত সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র: যেন স্বাধীনতা উপায় মাত্রের অধিক, স্বাধীনতাই উৎস: মানুষের কাজের, আবেগের, চেতনার; যেন আধ্যাত্মিক ধারণা, মনোজ অবস্থা; আরো সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয়, সেখানে স্বাধীনতার ঐ দুই পর্যায়ই ক্রিয়াশীল; আধ্যাত্মিক বোধ তাকে সত্যে উপনীত করে, আর মনুষ্যত্ব বোধ তাকে মিথ্যার প্রতিবাদী করে তোলে। সত্য কি? সত্যই স্বাধীনতা, কিংবা সত্যই ঈশ্বর; স্বাধীনতা ঈশ্বরের অন্য নাম। স্বাধীনতার ঐ আধ্যাত্মিক বোধ ব্যক্তির আত্মায় অধিষ্ঠিত, সমাজের মধ্যে ক্রিয়াশীল নয়; কিন্তু ঐ বোধ ব্যক্তিকে ছেঁকে তোলে স্বচ্ছতার মধ্যে, সে তখন চৈতন্যকে পূর্ণতা দেয় সত্যের সংস্পর্শে। ঐ পর্যায়ে ব্যক্তির পরীক্ষা নিজের সঙ্গে, সে হাৎড়ে হাৎড়ে চলে স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গে, হামাগুড়ি দেয় আবিল অন্ধকারে, সেই পরীক্ষায় কোন বন্ধনই তার জন্য সত্য নয়। সমাজ—অন্য স্বাধীনতার ঐ বোধ ব্যক্তির মনোজ অবস্থা, অচেতনের অন্তরঙ্গ। আর মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বাধীনতার ধারণা কাজ করে সমাজে। মানুষের পরস্পর সম্পর্কই সমাজ, ঐ সম্পর্ক রাষ্ট্র নির্ণীত করে। ঐ নির্ণায়ন বহুতর ক্ষেত্রে, ঐ সবের মধ্যে তার বিষম পরিস্থিতি স্বাধীনতার বেগ জোগায়। স্বাধীনতার প্রতিনিধি মানুষ আর বন্ধনের প্রতিনিধি ঐ সব সম্পর্ক, সমাজের মধ্যে ঐ দ্বন্দ্ব বিকাশিত হতে থাকে; ইতিহাসের অভিজ্ঞতা তার নাম।

সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ স্বষ্টিশীল হয়ে ওঠে। ঐ স্বষ্টিশীলতা স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত, সেজন্য সংস্কৃতিতে নিরন্তর ধ্বনিত : স্বাধীনতা। সৃষ্টিশীলতা যা রশ্মির মতো নিঃসৃত, নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত, বীজের মতো অন্তর্ভুক্ত তা বন্ধনের বিপরীত ; যেন নতুন, নিত্য অজানা, অবিরল দিগন্ত কিংবা জীবন-যাপনের মাল মশলা ; মানুষকে সৃষ্টিশীল হতেই হয়, না হয়ে তার উপায় নেই, সৃষ্টিশীলতার মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠে অবিকার, নিষ্কলুষেয়, অমোঘ ভাবে সত্য। সেজন্য সৃষ্টিশীলতা সংস্কৃতির ফ্রেমে স্বাধীনতা তৈরী করে। ব্যক্তি স্বষ্টিশীল, সে পেরিয়ে যায় সহস্র শিকল ; আর ব্যক্তির স্বষ্টিশীলতা সমাজে তৈরী করে দীপ্যমানতা, সংস্কৃতি সমষ্টির মধ্যে সঞ্জীবিত করে মুক্তির আবেগ। একটি কবিতা, একটি চিত্র, একটি গান কিংবা একটি বাগান রচনা ব্যক্তি থেকে উৎসারিত হয়ে সমাজে প্রাণ পায়, সেই হচ্ছে সংস্কৃতির সারাৎসার ; ঐ সবের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি স্বাধীন করে তোলে নিজেকে, আর স্বাধীনতা স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পায় সংস্কৃতির মধ্যে, ঐ কারণেই স্বাধীনতা মনুষ্যত্বের আদর্শ। একটি অন্যটিকে আলোকিত করে, একটি না হলে অন্যটি হয় না, ব্যক্তি থেকে শুরু, নদীর মতো সমাজে প্রবহমান, তার মানচিত্রটি সংস্কৃতি, আর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত তৈরী হয় স্বাধীনতা, পাড়ে পাড়ে, বাঁকে বাঁকে, জনপদে ; দেয় উদ্দীপনার মুহূর্ত, আবিষ্কারের খুশী, অনুল্লিখিত সাদৃশ্য, পরাক্রান্ত ও প্রতিধ্বনিত স্বষ্টিশীলতা, আর তাই : স্বাধীনতা।

সংস্কৃতির ফ্রেমে ব্যক্তির কাজ, ব্যক্তির চলাফেরা, পরস্পর প্রবিষ্ট ; এ সম্পর্ক পরস্পরকে ফলবান করে ; সেজন্য ব্যক্তির বিকাশ আত্মবশ নয়, তার বিকাশ ও উদ্যমের ক্ষেত্র সংস্কৃতির ফ্রেমেই। ঐ বিকাশ ও উদ্যমের সংকোচন বা বিলুপ্তি সংস্কৃতি থেকে, তাই সুশৃঙ্খল ও নিয়মাধীন সংস্কৃতি ব্যক্তির জন্য কারাগার। কারণ ঐ শৃঙ্খল ও নিয়ম আরোপিত, তাই দুঃসহ, স্বষ্টিশীল ব্যক্তির বিরোধী। এভাবেই ব্যক্তি বনাম সংস্কৃতি কিংবা ব্যক্তি বনাম সমাজ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধে পরিণত, ব্যক্তির বিপরীতে উপস্থিত সংস্কৃতি কিংবা সমাজ। অথচ ঐ দ্বন্দ্ব বানানো, ব্যক্তি সংস্কৃতি কিংবা সমাজের বিরোধী প্রত্যয় নয়। স্বাধীনতা স্বষ্টিশীল, সংস্কৃতি ঐ স্বাধীনতার ফ্রেম তৈরী করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে স্বষ্টিশীল করে তোলে। অধিক সংখ্যক ব্যক্তির স্বষ্টিশীলতা যে-সংস্কৃতি তৈরী করে সেই সংস্কৃতিই আদর্শ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিরোধ আছে। একপক্ষে সংস্কৃতি নিরীক্ষা ও ভ্রান্তির বিষয়, ঐ সবের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির স্বষ্টিশীলতা ; অপরপক্ষে সংস্কৃতি একমাত্র ও সার সত্য, নির্দিষ্টের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির

বিকাশ। দুই পক্ষের অন্বিষ্ট স্বাধীনতা। কিন্তু একপক্ষের কাছে স্বাধীনতার উৎস স্বতস্ফূর্ততা ; অন্যপক্ষের কাছে স্বাধীনতার অন্বেষণ সমষ্টির উদ্দেশ্য থেকে। স্বষ্টিশীলতা কেন তার জবাব মেলে স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে। কার জন্য তার জবাব আছে সমষ্টির কাছে। ব্যক্তিক স্বাধীনতা এবং সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কিত স্বাধীনতা এক সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দুরূহ। অবশ্য সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কিত স্বাধীনতা ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়েই, সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ব্যক্তির ফ্রেম নির্দিষ্ট করে। অগ্রাধিকারের সঙ্গে কি স্বতস্ফূর্ততা মেলানো সম্ভব?

ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা সবকিছুই সৃষ্টিশীলতার জন্য। স্বষ্টিশীলতা বিরোধী যে-কোন উদ্যোগ কিংবা কর্ম ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা জখম করে, ঐ জখম তৈরী করে ফের প্রতিরোধ পর্যায়ে পযায়ে। সমাজের সব কর্মেরই মূল্য অনন্য, মানবিকতার দিকে অগ্রসরশীল, সেজন্য অগ্রাধিকার ও স্বতস্ফূততা বিরোধী প্রত্যয় নয়, বরং পরস্পর সম্পর্কিত; সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন স্বতস্ফূর্ততার ফ্রেম পর্যায়ে পর্যায়ে তৈরী করে চলে। সমাজের পর্যায়ে পর্যায়ে স্বাধীনতা, সংস্কৃতির পর্যায়ে পর্যায়ে স্বতস্ফূর্ততা, তাহলেই ব্যক্তির পক্ষে স্বষ্টিশীল হওয়া সম্ভব, তাহলেই নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক ও সার্বিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীনতা হরণ আর সম্ভব নয়। সমাজের পর্যায়ভিত্তিক স্বাধীনতা, সংস্কৃতির পর্যায়ভিত্তিক স্বতস্ফূর্ততা রাষ্ট্রকে মানবিক করে তোলে। সমাজের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যক্তির স্বাধীনতা বাড়ায়, আর সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ততা ব্যক্তির স্বষ্টিশীলতা প্রসারিত করে, আর অগ্রাধিকার সমাজের দিকের বিকেন্দ্রীকরণ ও সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে স্বষ্টিশীল সম্পর্ক তৈরী করে, ঐ সম্পর্ক নিরন্তর দ্বান্দ্বিক।

ঐ সম্পর্কের ভিত্তি: সমালোচনার বোধ ও ঐতিহ্যের বোধ। সমালোচনার বোধ মানসিক অলসতা ঝেঁটিয়ে দূর করে, বুদ্ধিকে সজাগ ও মননকে প্রখর তীব্র তীক্ষ্ণ করে তোলে। আর ঐতিহ্যের বোধে আছে যা-কিছু গড়ে উঠেছে তার প্রতি মমত্ববোধ। ঐ দুই কি পরস্পর বিরোধী? জবাব: না, যদিও দুইয়ের মধ্যে আছে আততি। ঐ ক্রমিকতার বোধ, বিচার করবার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ করবার আকুতি থেকে তৈরী হয় ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি। ঐ মনোভঙ্গির উপাদানাবলী হচ্ছে সমালোচনার ক্ষমতা, বিচার, সেই সঙ্গে সম্পর্ক ও ক্রমিকতার বোধ। স্বাধীনতা স্বষ্টিশীল হয়ে ওঠে ঐ মনোভঙ্গির প্রসার থেকে। ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা -সব কিছুই সমালোচনার অধীন এবং কোন কিছুই পবিত্র নয়। ঐ সব কিছুই

বিচার করা, সব কিছুর মধ্যেকার সম্পর্ক খুঁজে বের করা এবং সব কিছুর ক্রমিক পরিবৃদ্ধির ধারণা সমালোচনার বোধ সৃষ্টিশীল করে তোলে। ব্যক্তি ঐ পথে মানবিক হয়ে ওঠে, সব উপাদান আকৃতি পায় মানবিকতার ছাঁচে।

স্বাধীনতা সেজন্য মানবিকতার অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতার খিদে নিরন্তর, তার নিরসন নেই। ব্যক্তি সৃষ্টিশীলতার পথে ঐ খিদে মেটাবার চেষ্টা করে কিন্তু খিদে থেকেই যায়। ঐ ব্যবধান তার অভিজ্ঞতায় এক গভীরতর অর্থ সঞ্চার করে; দৈনিক জীবন যাপনের অন্তরালে, রুটি ও গোলাপের টানাপোড়েনের ফাঁকে অবিরল তাই ধ্বনিত: স্বাধীন হও, স্বাধীনতা জয় করো। ঐ জয়ে আছে সৃষ্টিশীলতার ভিন্ন এক দ্যোতনা, সৃষ্টিশীলতাকে প্রাকৃতিক পর্যায় থেকে মানবিক পর্যায়ে টেনে আনা। প্রাকৃতিক পর্যায়ে পরিবর্তন মানবিক দায়িত্বের পরপারে। কিন্তু মানবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ব্যক্তিক দায়িত্বের অন্তর্গত। ব্যক্তি পরিবর্তনের দাস কিংবা শিকার নয়; ব্যক্তি পরিবর্তনের স্রষ্টা; ঐ সৃষ্টিশীলতাই স্বাধীনতা, ঐ স্বাধীনতাই ব্যক্তিক দায়িত্ব।

পরিবর্তন শূন্যে নয়, সমাজে, সংস্কৃতিতে; সেজন্য ব্যক্তিক ভূমিকা সমাজে সংস্কৃতিতে দায়িত্ব গেঁথে তোলে। দায়িত্ব দূরস্পর্শী দুর্বারভাবে শুদ্ধতান্মুখ। তার জিজ্ঞাসা: আমি নিজেকে সকল অবরোধ থেকে কি করে মুক্তি দেব। তার বহুবিধ পরীক্ষা: উন্মোচিত হৃদয়ে কত বিচিত্র বিরোধ, মানবাত্মার বহুস্তব বুঝতে পারব। ঐ দুই দিক পরস্পর সংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। দায়িত্বে তাই বিচ্ছুরিত আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞান। সেজন্য পরিবর্তনে সে তার দায়িত্ব যোগ করে। ঐ যোগ সৃষ্টিশীল, স্বতস্ফূর্ত; আরোপিত নয়; সেজন্য সে আরোপিত চিন্তার কিংবা নেতৃত্বের দাস নয়: সে, সৃষ্টিশীল; সে, তাই স্বাধীন।

২

শিল্পের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব চিরকালের। শিল্প হচ্ছে স্থায়ী এক বিপ্লব, নিরন্তর তার পরিবর্তন, ক্রমাগত বদলে চলে রুচি, ঝোঁক, আদর্শ, আঙ্গিক; ব্যক্তিক সৃষ্টি কখনোই থেমে থাকে না। সেক্ষেত্রে সমাজের পরিবর্তন মন্থর, শ্লথগতি; মৌল পরিস্থিতি বিপ্লব-সম্ভবা সত্ত্বেও বিপ্লব সহসা উৎপন্ন হয় না, সেজন্য সমাজ বিপ্লব কিংবা বিপ্লব সম্ভবা পরিস্থিতি রক্ষণশীল নন্দনতত্ত্ব খুঁজে চলে। ঐ নন্দনতত্ত্ব পূর্ব নির্ধারিত অর্থের বাহন, তার দরুন ব্যক্তির অন্তর দীপ্ত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন। শুরু হয় দ্বন্দ্ব, সৃষ্টিশীল ব্যক্তি নিমজ্জিত

হয় নেতিবাচক স্বাধীনতায়। ঐ স্বাধীনতাই আতঙ্ক। শিল্পের ঐ অবস্থা কি বলা যায় স্বাধীনতামুখী অভিযান ?

স্বাধীনতা সৃষ্টির জন্য এবং স্বাধীনতা সবার, সেজন্য আজীবন আমৃত্যু সম্ভাবনার সমগ্রতাই সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, এভাবে সকল পথ প্রতিটি ব্যক্তির দিকে এবং প্রতিটি পথ সকল মানুষের দিকে, স্বাধীনতা তাই নিরন্তর সম্ভাবনা। ঐ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধ সকল মানুষের এবং মূল্যবোধ প্রতিটি ব্যক্তির ছাঁচ। সমাজের যে-কোন সিদ্ধি, কবিতা কিংবা চিত্র কিংবা গান সবার, প্রতিটি ব্যক্তির উপঢৌকন, যেন পথ নিষ্কাশনের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার।

কিন্তু যে-সমাজের আমরা বাসিন্দা, সেখানে নিষ্কাশনের পথ সীমিত, সেখানে প্রতিটি ব্যক্তির সম্ভাবনা হরণ করে সকল মানুষের সংজ্ঞা তৈরী হয়। একজন জানে, বাকিরা জানে না ; একজন সমঝদার, বাকিরা বর্বর ; একজনের স্থান অপরিবর্তনীয়। ব্যক্তির ঐ ভূমিকা আরো জোরালো হয় রাষ্ট্রের প্রশাসন ও শিল্পায়ন নীতি থেকে, ঐ নীতি তৈরী করে তোলে শিক্ষিত এলিট শ্রেণী। ঐ এলিট শ্রেণীর সংস্কৃতি, পেশা, জীবনচর্যার মান ভিন্ন, স্বতন্ত্র ; লোকসাধারণের ওপর তার অভিজ্ঞতা প্রবল ও বলীয়ান ; শিল্পীদের সম্বন্ধে চালু হয় নানা রূপকথা, বিশেষ দাবি ওঠে শিল্পীদের জন্য। শিল্প ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতা, এলিট সংস্কৃতি নির্বস্তুক মূল্যবোধ গড়ে তোলে, আর লোকসাধারণ হয়ে ওঠে নতুন ধরনের এক বর্বরজাতি, ঐ বর্বরতার লিখিত হচ্ছে এলিটদের জন্য বানানো শিল্প তাঁদের বুদ্ধির অগম্য। শুরু হয় দ্বন্দ্ব, বিরোধ, স্বার্থের সংঘাত। এলিটরা সংঘবদ্ধ হয়, শিল্পীরা মাতাল হয় নন্দনতত্ত্বে, অন্য পক্ষে সমাজের সংঘবদ্ধতার জন্য দরকার একসার মূল্যবোধ, সেইসব এলিটরা চালু রাখে, জামার তলায় পরস্পরবিরোধী স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা কোলাহল করে ; এলিটরা তৈরী করে নিজেদের মতো এক সাংস্কৃতিক কানুন, আর লোকসাধারণের জন্য ভিন্ন এক, ঐ বৈপরীত্য কখনো সমান্তরাল, কখনো মুখোমুখি।

অন্য এক বৈপরীত্য উৎপন্ন হয় শিল্পের নিজের কানুন থেকে। সমাজের কানুন শিল্পের নয়, সেজন্য ঐ কানুনে শিল্প বশ করা যায় না। শিল্পের নিজস্ব কানুনে অন্তর্গত শিল্পের ঐতিহ্য, আঙ্গিক, ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতা। সৃষ্টিশীলতা শিল্পের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক মেনে ভেঙ্গে গড়ে বেড়ে ওঠে। সৃষ্টিশীলতা ব্যক্তিক আর ব্যক্তিটি সমাজ অন্তর্গত, সেজন্য সমাজের নিয়ম ব্যক্তির মানস পরিমণ্ডলে

অভিঘাত ছড়ায়, ব্যক্তির ভাবতে শেখায় দেখতে শেখায় প্রভাব হানে, কিন্তু ঐ ভাবনার অনুবাদ কিংবা দেখার তর্জমা শিল্পের নিয়মে, ঐ কারণে সমাজ যোগায় শিল্প প্রসঙ্গে ধারা বিবরণী। ঐ বিবরণী শিল্প বিচার নয়। শিল্পই স্থায়ী বিপ্লব, ঐ বিপ্লব সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে সমাজের রক্ষণশীল নিয়ম থেকে স্বাধীন করে তোলে, তার শিল্পের মধ্যে সঞ্চারিত করে নতুন বোধ যন্ত্রণা আশা হতাশা বিশ্বাস, ঐ পথে সমাজ গেঁথে গেঁথে আসে, সংলগ্ন হয়, ফের শুরু হয় বিরোধ, দ্বন্দ্ব, চিরকালীন।

স্বাধীনতা শিল্পের স্বভাব আর সৃষ্টিশীলতা ব্যক্তির। যদি স্বাধীনতার অবলোপ ঘটে, তাহলে শিল্পের স্বভাব নষ্ট হয়, ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতা সাহসী হতে ভুলে যায়। সমাজের রক্ষণশীলতা শিল্পের নন্দনতত্ত্বে প্রবিষ্ট হয়, ঐ নন্দনতত্ত্ব ফের শিল্পে অন্তর্গত স্থায়ী বিপ্লবের বিরোধিতা শুরু করে। কারণ রক্ষণশীল সমাজে শিল্পের বিপ্লব মারাত্মক, তার অভিঘাত ছিন্নভিন্ন করে তোলে সমাজকে, ব্যক্তিক সৃষ্টিশীলতা স্বাধীনতার বীজ উড়িয়ে দেয়, ছিটিয়ে দেয়, যেন বাঁশী বাজে দিকে দিগন্তরে, ব্যক্তি সাহস করে সবকিছু। ব্যক্তি এপথেই সমাজে সর্বনাশ হানে, সৃষ্টিশীলতা এ পথেই ব্যক্তির জামার তলায় ভিন্ন এক বোধ লালন করে।

শিল্পত স্থায়ী এক বিপ্লব, ব্যক্তিক সৃষ্টি সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিপ্লবের বীজ ছিটিয়ে দেয়, যেন আলো থেকে আলো জ্বালা, সেজন্যই সমাজ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিকে ডরায়, তাকে নিরন্তর চেষ্টা করে খাঁচায় পুরে রাখতে। কিন্তু মানুষকে ত বানানো যায় না, কখনোই না, সে সর্বত্র এবং চিরকাল নিজেকে সৃষ্টি আর পুনর্সৃষ্টি করে চলে, সে অবিরাম পেরিয়ে যায় রেডিমেড সংজ্ঞা, মতামত; সে যেন আলো সমাজেই জ্বলে।

ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতি

ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতি বর্তমান বাংলার মধ্যে দুর্বিনীতভাবে অবস্থান করছে। ভবিষ্যতের পথ বর্তমানের মধ্যে দিয়ে, ঐ যাত্রায় অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, জটিলতা, বিরোধ; সেজন্য যাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা জরুরী। বর্তমান সমাজ কাঠামোর মৌলিক বদল শুরু হয়েছে; অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে যাচ্ছে; সমাজবিন্যাস নষ্ট হচ্ছে; গ্রামাঞ্চল বিপর্যস্ত; শহরে অভাব, প্রশ্ন, তর্ক।

সেজন্য প্রথম বোঝা জরুরী বর্তমান অবস্থাটা কি। সংস্কৃতির চেহারা কি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহর ও গ্রামে সাক্ষরতার তফাৎ অনেক। সাক্ষরতা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপকরণ, সেক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজ সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করতে অক্ষম। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান সমাজ, অথচ শহরের সংস্কৃতি প্রবল ও বলীয়ান। দুইয়ের ব্যবধান অপরিমাণ, সেজন্য লোক-সংস্কৃতির ক্ষয় একপক্ষে দ্রুত, অন্যপক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষাই সংস্কৃতির অনিবার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। কারণ, বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের ন্যূনতম উপকরণ। সেক্ষেত্রে এ প্রশ্নও জরুরী সাক্ষরতা যথেষ্ট কিনা। সংস্কৃতির জন্য সাক্ষরতারও অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে শহরের প্রাধান্য, তেমনি ঐ অতিরিক্ত উপকরণ শহরেই বেশী। জীবনধারা ও অভিজ্ঞতা গ্রামীণ সমাজে উত্তাল, উতরোল, সেখানে সাংস্কৃতিক মাধ্যম অনুপস্থিত; যেখানে উপকরণ আছে সেখানকার জীবনধারা ও অভিজ্ঞতা বাংলার গ্রামীণ সমাজে প্রতিধ্বনিত নয়।

বাংলার গ্রামীণ সমাজ স্বল্পসাক্ষর সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ও বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে রক্তিম। লোকসংস্কৃতির ক্ষয় সুস্পষ্ট, তার কারণ কেবল নিরক্ষরতা নয়। নিরক্ষরতা সংস্কৃতির বিকাশে শক্তিমান বাধা তাও সত্য নয়। লোকসংস্কৃতি যখন সজীব থাকে তখন নিরক্ষরতা সংস্কৃতির বিকাশে প্রাচীরের বিভেদ তৈরী করে না। মুখে, পালায়, কবিগানে, পুরুষানুক্রমিক চর্চায় ঐ সংস্কৃতির প্রকাশ

ঘটতে থাকে। বর্তমানে ঐ পুরুষানুক্রমিক চর্চা কিংবা পালাগান কিংবা কবিগান জীবিকার কারণেই নষ্ট, তার দরুন লোকসংস্কৃতির বিকাশ গ্রামীণ সমাজে আর সম্ভব নয়।

বর্তমান বাংলা সমাজে বৈচিত্র্য কম। গ্রামে চাষী কিংবা জমিনির্ভর মধ্যবিত্ত। সকলের জীবিকাই জমি, সকলের মন ঐ ছাঁচে গড়া। শহরের মধ্যবিত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকরি নির্ভর। কারখানার মজুর আধাচাষী আধা-শ্রমিক। নানা জীবিকা, নানা জীবনযাত্রা, নানা অভিজ্ঞতার পরিসর বাংলা সমাজে সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে শ্রেণীসংঘাত তীব্র। ফলে সামাজিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন, উদ্ভূত হচ্ছে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুভূতির খণ্ডীভবন, স্পষ্ট হচ্ছে সমাজের বিশেষীকরণ, তার দরুন অনুভূতি ও সংস্কৃতির সর্বজনীনতা হচ্ছে নষ্ট।

সংস্কৃতি বর্তমানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আবর্তিত, তার দরুন সংস্কৃতি সর্বজনীনতা ছেড়ে গোষ্ঠী আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। শ্রেণী সমাজে যত নতুন গোষ্ঠী সজীব সক্রিয় চঞ্চল হবে ততই সংস্কৃতি সমাজের নানা স্তরের প্রতিনিধিত্ব করবে। কিন্তু একটি কি দুটি গোষ্ঠী সজীব, বাকী সব ক্ষীয়মাণ, সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিকাশের বদলে দেখা দেয় আবর্ত। বর্তমান বাংলা সমাজে নানা গোষ্ঠী নানা স্তর সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ নয়। একটি মাত্র মধ্য গোষ্ঠী উদ্দীপিত, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয়, বাকী গোষ্ঠীগুলি নিষ্ক্রিয় কিংবা মৃত। লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষা অবলুপ্ত। বাংলা সংস্কৃতির দুর্বলতা এখানেই।

অন্যপক্ষে সমাজ ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনসাধারণের শক্তিতে বিচলিত। ঐ শক্তি নিহিত অনামা এক ভয়ঙ্করের মধ্যে, ঐ ঐতিহাসিক শূন্যতাই সর্বনেশে, সেজন্য আধুনিক মিথ নির্মাতারা শ্রমজীবী শ্রেণীকে নূতন এক ব্যবস্থার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারে উদ্যত। বিপ্লবের নাটকে তারা ঝুলছে, ঐ হচ্ছে তাদের যন্ত্রণা।

বর্তমান বাংলা সমাজের চেহারা কি। সমাজ জীবনে, মধ্যশ্রেণী ছাড়া, বৈচিত্র্যের অভাব গোচচার। ইংরেজ সাম্রাজিক অভিযান ও পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক শোষণের দরুন মধ্যশ্রেণীর সমাজ বিবর্তন বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। বাংলার মধ্যশ্রেণীর পটভূমি কৃষিভিত্তিক, তার দরুন য়ুরোপীয় মধ্যশ্রেণীর নগরসুলভ মনোভাব এক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। কৃষিভিত্তিক পট থাকার দরুন মধ্যশ্রেণীর মানসে পরোক্ষ হলেও লোকজ আশা আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত, সেই

সঙ্গে আমলাতন্ত্রী ফ্রেমে কাজ করার দরুন ও আমলাতন্ত্রে সংলগ্ন হওয়ার দরুন লোকবিরোধী ভূমিকাও স্পষ্ট। গ্রামীণ জীবনে প্রসার ও বিকাশের বদলে নিদারুণ সংকোচন। পূর্বে একটা শিক্ষা সামান্য ছিল যার দরুন সংস্কৃতি অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ভেদরেখা পেরিয়েও পরিব্যাপ্ত হতে পারত। সম্প্রতিকালে সেই সর্বজনীনতা নষ্ট, ফলে সংস্কৃতি খণ্ডিত। অন্য-পক্ষে সাধারণ লোক পূর্বতন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখতে অক্ষম। সেজন্য তাদের সংস্কৃতির শৌখীন মুরুব্বী বর্তমানে শহরের মধ্যশ্রেণী। আবার, শহর গ্রামের তফাৎও প্রচণ্ড।

আমরা এখন কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছি? একপক্ষে মধ্যবিত্ত এলিট গোষ্ঠী বিপর্যস্ত, অন্যপক্ষে রাজনৈতিক আবর্তে যে-সব শ্রেণী প্রবল তাদের সংস্কৃতি রচনা করবার ক্ষমতা স্পষ্ট নয়। অথচ তাদের প্রবলতার ছাপ সমাজ মনে নিশ্চিত। কারণ স্পষ্ট, অর্থনৈতিক তাগিদে নতুন শ্রেণী সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হচেছ, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিকাশের কোন দরজা খোলা পাচেছ না। সেই সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর এলিট গোষ্ঠীর প্রাধান্য কমছে, এলিট গোষ্ঠীর মধ্যেও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটছে।

তাহলে ভবিষ্যতের পথ কি।

বর্তমান বাংলা এক সংস্কৃতি সংকটে আবর্তিত, ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির ভিত্তি প্রসারণের মধ্যেই ঐ সংকটের উত্তরণ। এখনকার সংস্কৃতি গোষ্ঠী আশ্রয়ী, সর্বজনীন নয়। অন্যপক্ষে সমাজের বিশেষীকরণের যুগে জটিলতাবর্জিত কৃষিজীবী সমাজের অখণ্ডতা তৈরী করা সম্ভব নয়।

আরো বিভিন্ন বিশ্লেষণের বয়ন দরকার। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। ভবিষ্যৎ বাংলার রাষ্ট্র কাঠামো হবে জনগণতান্ত্রিক, ঐ কারণেই সংস্কৃতির চরিত্র হবে জনসংস্কৃতি। উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ এবং সুযোগসুবিধার সামাজিকীকরণ সমাজের শ্রেণীভেদ অপসারণ করবে, অন্যপক্ষে ব্যক্তিক প্রতিভা ও ক্ষমতা অবাধে বিকাশ লাভ করবে। সমাজের বিকেন্দ্রীকরণ আমলাতন্ত্র খর্ব করে তুলবে এবং ব্যক্তিক প্রতিভা ও ক্ষমতার বিকাশ স্বতস্ফূর্তির পরিসর তৈরী করবে। সমাজের বিকেন্দ্রীকরণের দরুন গ্রাম ও শহরের ব্যবধান দূর হবে, বর্তমানের একপেশে শহরভিত্তিক সংস্কৃতির বদলে সংস্কৃতির সামাজিকীকরণ সম্ভব হবে। শ্রেণীদূরত্বের অপসারণ এবং সমাজের মধ্যেকার স্থানিক দূরত্বের অবলোপ সংস্কৃতিকে জীবননিষ্ঠ করে তুলবে। সমাজের বিকেন্দ্রীকরণের দরুন

একসমাজের মধ্যেকার কেন্দ্রিক সংস্কৃতির জায়গায় বহুকেন্দ্রিক সংস্কৃতি উৎসারিত হবে, ফলে জনসাধারণের অংশগ্রহণ সৃষ্টিশীল ও সার্থক হয়ে উঠবে। এককেন্দ্রিক সংস্কৃতি তৈরী করে আঞ্চলিকতা, বহুকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে আঞ্চলিকতা সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে খর্ব হবে।

রাষ্ট্রের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধার সামাজিকীকরণের দরুন বাঁচার উপযোগী মজুরী ও প্রচুর অবকাশের ব্যবস্থা সম্ভব হবে। সেজন্য জনসাধারণের সর্বস্তরের পক্ষেই তখন সম্ভব সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ, সেই সঙ্গে ব্যক্তিক অংশগ্রহণকে সৃষ্টিশীল করে তোলা। অন্যপক্ষে ঐ ভিত্তিতে ব্যক্তি বনাম সমাজ দ্বন্দ্বের অপসারণ হবে বলে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক হবে সৃষ্টিশীল ও দ্বান্দ্বিক, সেজন্য সৃষ্টিবিরোধী শক্তিগুলির মাথা চাড়া দিয়ে উঠা রোধ হবে। বর্তমান পর্যায়ে ব্যক্তি বনাম সমাজ দ্বন্দ্ব তীব্র বলে আমলাতন্ত্র অপরিহার্য, মধ্যশ্রেণী আমলাতন্ত্রে সংলগ্ন, সেজন্য আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের যন্ত্র এবং মধ্যশ্রেণী উদ্ভূত আমলাতন্ত্র গণবিরোধী। ভবিষ্যৎ পর্যায়ে সামাজিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দরুন আমলাতন্ত্রের দরকার ক্ষীয়মাণ হবে, শাসন-ব্যবস্থা পর্যায়ে পর্যায়ে জনসাধারণের সংলগ্ন থাকবে। ঐ পর্যায়ে সংস্কৃতি সমাজের কোন-একটি শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষণ থেকে মুক্তি পাবে। সংস্কৃতি জন-সাধারণের সমাজের মধ্যে অবাধে সঞ্চারিত, সংস্কৃতি ব্যক্তিক পর্যায়ে এবং গ্রুপ পর্যায়ে সৃষ্টিশীল, তাই রাষ্ট্রীয় সংগঠন মানবিক ও জীবননিষ্ঠ।

ভবিষ্যৎ বাংলায় ব্যক্তির সংজ্ঞা হবেঃ জন্ম সময়ে সম্ভাবনার সমগ্রতা সকলে দেবে প্রত্যেককে এবং মৃত্যুর সময়ে সেই ব্যক্তি উপঢৌকন দেবে তার অবদান সকলকে। এভাবেই প্রতিটি ব্যক্তির সকল পথ নিজের দিকে এবং সকল পথ সবার দিকে, যেন সৃষ্টিশীল সে, তারা ; সমাজে, সময়ের পরপারে ; সর্বদর্শী নক্ষত্রের মতো ; স্তবে, ধ্যানে, কর্মে, আবেগে কিংবা উচ্ছ্বাসে। এভাবেই সম্ভব হবে বহুর মধ্যে ঐক্যের সংহতি, অভিপ্রায়ের অখণ্ডতা, বহুমুখী হীরক বিকিরণ। বাস্তব ও মনোলোক পরস্পর সংস্পৃক্ত, সংস্কৃতি তারই মানচিত্র ; বিভিন্ন অতীত, অন্তর্গত বর্তমান, উদ্গত ভবিষ্যৎ তার সম্পদ ; ব্যক্তির সঙ্গে এভাবেই অমোঘ তার সম্বন্ধ।

আর ঐতিহ্য ?

ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে কাজ করে যাবে বাংলা সংস্কৃতির মানব স্বীকৃতি। এই মানব-স্বীকৃতি সংস্কৃতিকে প্রশস্ত ও উদ্দীপ্ত করেছে, সেজন্য বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ বরাবর ঐ পথ ধরে। আধ্যাত্মিকতায়

জর্জরিত হয়েও বাংলা সংস্কৃতিতে বারবার মানব অভ্যুত্থান ঘটেছে প্রবল ও বলীয়ান ভাবে, সেই সঙ্গে স্মৃতি, লোকাচার, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ তাকেই সমর্থন করার যুক্তি খুঁজে ফিরেছে। বাংলার ইতিহাসের এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ চারিত্র।

২

সংস্কৃতি বেড়ে চলে সমাজের নিয়ম মেনে। শ্রেণী ও স্তরবিভক্ত সমাজের নিয়মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি সমাজের স্থানিক ও আঞ্চলিক দূরত্ব সংস্কৃতিব চেহারা নিরূপিত করে। বাংলাদেশ ঐ নিয়মের অধীন, সেজন্য বাংলা সংস্কৃতি একপক্ষে স্তর বিভক্ত অপরপক্ষে বাংলা-সংস্কৃতিতে গ্রথিত স্থানিক ও আঞ্চলিক দূরত্ব। ঐ স্তরবিভক্তি কিংবা দূরত্ব কখনো সমান্তবাল, কখনো পর্যাযক্রমিব, সেজন্য লোকসংস্কৃতি এবং শ্রেণীসংস্কৃতি সমান্তরাল কিংবা পর্যায়-ক্রমিক ভাবে বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করে। ঐ কারণে বাংলা সংস্কৃতি একই সঙ্গে গ্রামীণ ও শহুরে, একই সঙ্গে লোকজ ও শ্রেণীসংলগ্ন, একই সঙ্গে আধুনিকতায় আক্রান্ত ও প্রাচীনতায় নিমজ্জিত। ঐ সহ অবস্থান, দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্যেই বাংলা সংস্কৃতি, কোন একটিকে সোচচার করার অর্থ বাকী-গুলিকে অস্বীকার করা, কিংবা তাদের প্রাধান্য হাল্কা করা।

সেজন্য বাংলাদেশের সমাজবিন্যাসের ওপর নির্ভবশীল বাংলা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ। সমাজে যদি শ্রেণী থাকে তাহলে এলিট'ও থাকবে, তারা সামাজিক অর্থে বলীয়ানদের জন্য তৈরী করবে গোটা মানুষের রেখাচিত্র, শিল্প; তারা তৈরী করবে সীমা, কানুন; ঐ সীমা ঐ কানুনের পরপারে লোকসাধারণের অবস্থান। মূল্যবোধেব অধিকার সবার নয়, সেজন্য প্রতিটি ব্যক্তির নির্যাস নিরূপণের পরিমাপ ঐ মূল্যবোধে সম্ভব নয়। সমাজের যে-কোন অর্জন, সে-কলকারখানার নূতন যন্ত্র কিংবা সাহিত্য কিংবা সঙ্গীত হোক, সবার জন্য সৃষ্ট, সেজন্য প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার ঐ সবে কিংবা ঐসব প্রতিটি ব্যক্তির আত্মিক সমৃদ্ধির নানা পথ। কিন্তু শ্রেণীসমাজে গোটা মানুষের সংজ্ঞা'য় ঐসব অধিকার বোধ নেই, গোটা মানুষ কিংবা সফল মানুষ সকলের অধিকার হরণ করে বড়ো, শ্রেষ্ঠ, কীর্তিমান; সে জ্ঞানী, সমঝদার, বিশেষজ্ঞ, সেজন্য তার স্থান অপরিবর্তনীয়, তার

অধিকার স্থায়ী। শ্রেণীসমাজে সংস্কৃতির কারবারীরা এভাবেই স্বতন্ত্র, ভিন্ন, অসংলগ্ন হয়ে ওঠে, যেন তাদের জামার তলার হৃদপিণ্ড অন্য মাপে চলে; সেই সঙ্গে স্থানিক ও আঞ্চলিক দূরত্ব সংস্কৃতির কারবারীদের মধ্যে নানান মধ্যযুগীয় ঝোঁক উগ্র করে তোলে, লোকসংস্কৃতি বনাম বাংলা-সংস্কৃতির কথা তুলে পৃষ্ঠপোষণার ভূমিকা তারা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে। গোটা সমাজটাই আসলে পিছিয়ে আছে, লোকসংস্কৃতিও তাই, সমাজটার অগ্রসরণ ঘটলে লোকসংস্কৃতিও পৃষ্ঠপোষণার ভার থেকে অব্যাহতি পাবে। যদি তা না হয় লোকসংস্কৃতি যাদুঘরের খোরাক হয়ে উঠবে, কিংবা সংস্কৃতিবিলাসীদের ব্যসনে পরিণত হবে, লোকশিল্প হয়ে উঠবে শহরের সাহেবদের সপ্তাহন্ত যাপনের বিষয়। সমস্যাটা তাই গোটা সমাজের, খণ্ডভাবে সংস্কৃতির নয়। যদি সমাজের মধ্যকার শ্রেণীর অবলোপ ঘটে এবং দেশের মধ্যকার বিভিন্ন দূরত্বের অপসরণ হয়, তাহলে, সংস্কৃতির মধ্যকার স্তরবিভক্তি, স্থানিক ও আঞ্চলিক দূরত্বজাত সমস্যাবলীর সুরাহা হবে, মূল্যবোধের অধিকারী সারা সমাজ হবে; শিল্পীদের সুযোগ সুবিধা সমাজই দেবে মূল্যবান, জরুরী, মানবিক কাজ বলে বিবেচনা করবে, শৌখীন সাংস্কৃতিক মুরুব্বীদের হিতৈষীপণার তখন দরকার পড়বে না। শহরের সুযোগ সুবিধা গ্রামে যদি ব্যাপ্ত হয় এবং গ্রামের স্বস্তি ও শান্তি শহরে, তাহলে, মানসিকতার ভেদচিহ্ন থাকবে না, গোটা সমাজটার তাল লয় দ্বন্দ্ব স্পন্দিত হবে মানুষের পরিমাপে, মুক্ত স্বাধীন স্বয়ংনির্ভর মানুষের জন্যই।

বর্তমান অবস্থায় গ্রাম অর্থ একটা সামাজিক অবস্থান। মানবিক সুযোগ-সুবিধা সেখানে ন্যূনতম; সেজন্য দরকার ঐ সামাজিক অবস্থানের বৈপ্লবিক রূপান্তর, ঐ অবস্থানের স্থিতি-স্থাপকতা নয়। বৈপ্লবিক রূপান্তরের উপযোগী মানসিকতা, আবহাওয়া, মেজাজ তৈরী করবে সমাজের সেই অংশ যারা অগ্রগামী, মানবিক নিয়তির নির্মাতারা। গ্রাম্য সংস্কৃতি নয়, কিংবা গ্রামের জন্য শহুরে উৎকর্ষতা নয়, জরুরী লোকসাধারণের চেতনার উপযোগী সংস্কৃতি, যার জন্ম এবং বৃদ্ধি জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে, কুরুচির বিরুদ্ধে প্রতিরোধে, লোকজ ঐতিহ্য আধুনিকতায় উত্তরিত করে। মানবিকতা প্রতিটি ব্যক্তিতে বর্তমান; ব্যক্তি, অন্যান্য মানুষ ও প্রকৃতি তার উপাদান; অন্যান্য মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক ঐক্যেই মানুষ তার বহুময় সম্পর্ক তৈরী করে; সংস্কৃতি তাই মানবিকতার দিকে অভিযান, ঐ তিন উপাদান তার ভিত্তি ও ভূমি। সেজন্য

সংস্কৃতি ঐ অর্থে নির্মাণ, ভার তাদের ওপর যারা যে-কোন সামাজিক অবস্থানকে মানব নিয়তির আদি-অন্ত মনে করে না, যারা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সমাজকে সংস্কৃতিকে নিত্য শোধন করার তাগিদ দেয়।

৩

জীবনের দিকে মুখ ফেরানোর নিয়ম ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন মণ্ডলে কাজ করবে। ঐ নিয়মের অন্যতম রচয়িতা বুদ্ধিজীবী। তার সূত্র: আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা; লক্ষ্য: প্রতিনিয়ত সংজ্ঞা শুদ্ধ করা। সংজ্ঞা ভাষারই চেতনা, সেজন্য বুদ্ধিজীবী অবিরল ও অনবরত ভাষা পরিচ্ছন্ন করে তোলে। ভাষা নষ্ট হয় চেতনার অভাবে কিংবা প্রয়োগের অপকৌশলে। বুদ্ধিজীবী তাই ভাষার রক্ষক, সেই সঙ্গে নিরীক্ষক: সে ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই সঙ্গে স্বাধীনও করে। সংজ্ঞা তার কাজের প্রকরণ, সংজ্ঞার মধ্যে ভাষাকে সে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট, চিহ্নিত ও সীমিত করে, সেজন্য সংজ্ঞা তার অস্ত্র।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর কাজ সংজ্ঞা তৈরী করা ও সমাজের মধ্যে সংজ্ঞার চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা। রাষ্ট্র ও সমাজ কিংবা সমাজ ও সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতি ও ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণের ওপর নির্ভরশীল সংস্কৃতির চেহারা, রাষ্ট্রের স্বরূপ, ব্যক্তির চরিত্র। সংজ্ঞা স্পষ্ট না হলে প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়, বহু আবর্জনা জড়ো হয়, তখন জখম হয় ব্যক্তির অধিকার। সেজন্য বুদ্ধিজীবীর কাজ অনবরত সংজ্ঞার পরিশোধন ও পরিশীলন, সব অবাস্তবতা বর্জন করে সংজ্ঞাকে মাত্র সর্বস্ব করে তোলা। ঐভাবে সে আবিষ্কার করে সংজ্ঞাজগতে লুকনো সম্বন্ধসমূহ, উদ্ভাসিত হয় বিভিন্নতার মধ্যে সূত্র, বুদ্ধিজীবী ঐ সূত্র সমন্বিত করে সমাজের ব্যবহার যোগ্য করে তোলে।

রাষ্ট্র অর্থ সরকার নয়; সমাজ অর্থ ব্যক্তি নয়। সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ততা ও জীবননিষ্ঠতার ভিত্তি ঐ প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান। কিন্তু ঐ ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয় যখন সংজ্ঞা সম্বন্ধে চেতনার অভাব ঘটে কিংবা পরিকল্পিত ভাবে সংজ্ঞা বিকৃত করা হয়। তখন সরকার রাষ্ট্রে পরিণত, ব্যক্তি নিমজ্জিত সমাজে। সচেতনতার অভাবের অর্থ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব; বিকৃতির অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে স্বার্থ সংরক্ষণ। প্রথমটি ছড়াতে পারে সারা সমাজে, অনেকটা কুয়াশার মতো, দৃষ্টি অন্ধ করা। দ্বিতীয়টির সঙ্গে জড়ানো কোন-একটি বিশেষ গ্রুপ কিংবা শ্রেণী। তার দরুন সংজ্ঞা কর্মিষ্ঠতা হারায়, সংজ্ঞার দরকার ক্ষীণ হয়ে আসে, কিংবা সংজ্ঞা পরিণত হয় স্বার্থ সংরক্ষণে।

এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব ঐ সংজ্ঞা নিরূপণ করা, সংজ্ঞা সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরী করা, সমাজে ছড়িয়ে দেয়া। সংজ্ঞার নিরূপণ উদ্দেশ্য ও মাত্রা স্পষ্ট করে, সংজ্ঞার সচেতনা অধিকারবোধ নির্ণীত করে, সমাজে তার পরিব্যাপ্তি লোকজমানসে ঐ অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। তার দরুন ক্ষমতার অপব্যবহার কমে আসে। রাষ্ট্র এবং সমাজে ক্ষমতার একটি ভিত্তি ও ভূমি আছে। ঐ ভিত্তি ও ভূমি একপক্ষে বাধ্যতামূলক, অন্যপক্ষে স্বেচ্ছামূলক। ব্যক্তি ঐ দুই স্পর্শ করে আছে। সংস্কৃতির পরিসর ঐ দুই মিলিয়ে।

রাষ্ট্র কতকগুলি মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে দেয়। ঐ সব অধিকার ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমা নির্দিষ্ট করে। ঐসব জীবনযাপনে ব্যবহার করে ব্যক্তি সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তির সমৃদ্ধি সমাজেরই সমৃদ্ধি, ঐভাবে রাষ্ট্র মানবিক হয়। প্রশাসনের দায়িত্ব সরকারের, ঐ দায়িত্বের অন্তর্গত ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ নয়। সেজন্য সরকার রাষ্ট্র নয়; কিন্তু সরকার কখনো কখনো রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্মক হয়ে ওঠে, ব্যক্তির তখন অপমৃত্যু ঘটে, অধিকার বোধ তখন ক্ষুণ্ন হয়, বিবেক নষ্ট হয়, সংস্কৃতি খাঁচাবদ্ধ হয়। সমালোচনার অধিকার রাষ্ট্রের অবাধ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়। ঐ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা সংস্কৃতির সংজ্ঞা স্পষ্ট নয় অথবা সংজ্ঞার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। তার দরুন সরকারের গ্রাসে তখন ধরা পড়ে রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সংস্কৃতি; সরকার প্রবল, বিশাল, বলীয়ান হয়ে ওঠে। ব্যক্তি কয়েদী হয়, সংস্কৃতির স্বতস্ফূর্ততা নষ্ট হয়, জখম হয় অধিকার বোধ। অথচ ঐ অধিকার বোধ ব্যক্তির প্রসারণের ভিত্তি ও ভূমি; ঐ বোধ সংস্কৃতির বিভিন্ন মঞ্জরী ফোটাতে সহায়ক। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রস্বীকৃত ও রাষ্ট্রগৃহীত; কিন্তু ঐ অধিকার মনুষ্যত্বের অঙ্গীভূত; ঐ অধিকার না হলে মনুষ্যত্ব মঞ্জরিত হয় না। সেজন্য ঐ অধিকার মৌল, মানবিক মূল্যবোধে সম্পৃক্ত। মৌল, কারণ, ঐ অধিকার মনুষ্যত্বেরই অভিব্যক্তি; মানবিক, কারণ, ঐ অধিকারের স্বীকৃতি বিহনে ব্যক্তি মানবিক হয় না; মূল্যবোধে সম্পৃক্ত, কারণ, ঐ অধিকার মঞ্জরিত না হলে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে না।

সেজন্য বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব হচ্ছে সংজ্ঞা সম্বন্ধে স্বচ্ছ আবহাওয়া তৈরী করা। রাষ্ট্র এবং সরকার, ব্যক্তি এবং সমাজের সংজ্ঞা অনুক্ষণ গণমানসে স্বচ্ছ রাখা। ঐ স্বচ্ছতা আলোর মতো, তার দরুন সমালোচনা স্বীকৃত; সমালোচনা করার অর্থ অধিকারের হরণ নয়। একপক্ষে সংজ্ঞার স্বচ্ছতা, অন্যপক্ষে সমালোচনার অধিকার ডিক্‌টেটরী উদ্যোগ ও প্রয়াস খর্ব করে তোলে এবং সমালোচনার অধিকারের সামাজিক ভিত্তির প্রসারণ ঘটে। অধিকারের সামাজিক

ভিত্তির প্রসারণ একপক্ষে ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ অন্যপক্ষে সমাজকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। সংস্কৃতি তখনই জীবননিষ্ঠ হয়।

রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা ব্যক্তির। সুযোগ সুবিধার সামাজিকীকরণ ব্যক্তির মৌল অধিকারেরই প্রসারণ। সেজন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার অর্থ তার মৌল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। সুযোগ সুবিধার অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে ট্যাক্স দেয়ার মাধ্যমে; সমালোচনার অধিকারের সামাজিক ভিত্তির প্রসারণ না হলে তাকেই ফের বঞ্চিত করা হয় সুযোগ সুবিধার সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। ঐ বৈপরীত্য ব্যক্তি বনাম সমাজ কিংবা ব্যক্তি বনাম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব প্রখর ও তীব্র করে তোলে, ঐ ক্ষেত্রে ব্যক্তিক পর্যায়ে সংজ্ঞা সম্বন্ধে ধারণা ও সামাজিক পর্যায়ে সংজ্ঞার স্বচ্ছতা ব্যক্তিক স্বাধীনতা কনিষ্ঠ রাখে, সামাজিক স্বতঃস্ফূর্ততার পরিসর তৈরী করে, সংস্কৃতি জীবনমুখী হয়। সরকার স্বাধীনতা হরণে কুণ্ঠাবোধ করে, স্বতঃস্ফূর্ততার পরিসরে বেড়ি পরাতে দ্বিধান্বিত হয়, সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়। সেজন্য দরকার অধিকারের সামাজিক ভিত্তি তৈরী করা। ঐ ভিত্তির সামাজিকীকরণ না হলে সরকারের পক্ষে ডিক্‌টেটরী ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে।

সমাজে একজন ব্যক্তি অধিকার সচেতন, বাকীদের চেতনায় অধিকার বোধের অভাব, তখন সরকার গ্রাস করে ঐ ব্যক্তিকে, তার স্বাধীনতায় শিকল পরায়, তার স্বতঃস্ফূর্তি কয়েদ করে। সরকারের ঐ কর্ম প্রতিবাদ জানায় না, সমাজ মেনে নেয়, ঐ পরিস্থিতি সংস্কৃতির জন্য অনুকূল নয়। অপরপক্ষে প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতা গণতন্ত্র সংলগ্ন সংস্কৃতির জন্য জরুরী; ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতা সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। রাষ্ট্রের চরিত্র সরকারের নীতির ভিত্তিতে বদলে চলে, তার দরুন রাষ্ট্রের চরিত্র সনাতন, কিংবা অনড় নয়। সেজন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক, স্থায়ী নয়; সরকার কোন-অবস্থায় কোন-সম্পর্কের প্রতিভূ; অপরপক্ষে সরকারের চরিত্রে রাষ্ট্রের মূলনীতি মেনে প্রসারিত হয়ে চলে। ঐ আদর্শ অবস্থার বদল হয় যখন সরকার রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ন ও সর্বগ্রাসী করার জন্য। ঐ অবস্থা ব্যক্তির জন্য আত্ম-অবমাননা কর, সংস্কৃতির জন্য শ্বাসরোধকারী ও গণতন্ত্রের জন্য আত্মহত্যার শামিল। ঐ অবস্থায় সংজ্ঞার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়; রাষ্ট্র অর্থে সরকার স্বীকৃতি পায়; সরকার সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে; স্বাধীনতা সরকারের পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত হয়; ব্যক্তির স্বত-

স্ফূর্ততা সন্দেহে পরিণত হয়। শেখানো হয়: বাধ্যতাই স্বাধীনতা; সরকার ভালোমন্দের বিচারক; প্রতিবাদ শব্দই অন্যায়ের, বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লব বৈদেশিক আমদানিজাত বিষয়।

বুদ্ধিজীবীর কাজ তাই সংজ্ঞার ঐ ধারণা আলোর মতো জেলে রাখা। সমাজের যে-অংশে বুদ্ধিজীবীর বাস সে-অংশ স্বভাবত সজ্ঞান ও স্বনিষ্ঠ, সেজন্য তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করার উদ্যোগ বিচিত্র নয়। আইন ও শৃঙ্খলার নামেই স্বাধীনতা হত্যা করা হয়, সামাজিক ঐক্যের নামেই ব্যক্তিকে বিধ্বস্ত করা হয়, তাই বুদ্ধিজীবীর আত্মরক্ষার উপায় সংজ্ঞার ধারণা অনবরত পরিচ্ছন্ন করা, সমাজে অমোঘভাবে সত্য করা। সংজ্ঞা যেখানে অবিকার সেই ক্ষেত্রেই সমাজে স্বাধীনতা দীপ্যমান; বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ঐ দিকেই।

৪

সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে গ্লানি ও অবসাদের ভাব বর্তমানে স্পষ্ট। সংস্কৃতি-জীবীদের মধ্যে কাজ সম্বন্ধে গৌরব অনুভবের বোধ শিথিল, কোন কোন ক্ষেত্রে স্তিমিত। পূর্বতন সংস্কৃতি বিপন্ন; নূতন সংস্কৃতি সোচ্চার নয়। সেজন্য সংস্কৃতি সঙ্কটের কারণ হচ্ছে: উৎকর্ষ কিংবা ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে গভীর অবজ্ঞার বোধ; সংশয়ের মধ্যে সজীব ও সবল চিন্তার আত্মাহুতি।

কেন এমন হচ্ছে? একটা কারণ খুব সম্ভব সামাজিক গঠন ও আর্থিক ব্যবস্থার ফলে সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ তার ভার প্রবল ও বলীয়ান। ব্যক্তিগত লাভ ও লোকসানের খতিয়ান সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই খতিয়ান থেকে সংস্কৃতি চর্চাও রেহাই পাচ্ছে না। অন্যপক্ষে শ্রেণী বিরোধ প্রবল, সেজন্য লোক-সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অনুভূতি সংস্কৃতিজীবীদের সূক্ষ্ম মনে অভিঘাত হানছে। তার দরুন সংস্কৃতিজীবীরা জীবনের কতক ক্ষেত্রে নিরুত্তর থাকতে পছন্দ করছেন, কতক ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার সমর্থন করছেন, কতক ক্ষেত্রে সমস্যা এড়িয়ে তুচ্ছ প্রসঙ্গে কায়মনোবাক্য যোজনা করছেন। অমন অবস্থার কারণ সমাজটার অধঃপতন, ব্যক্তির অক্ষমতা নয়।

সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি? বণিক প্রাধান্যের প্রারম্ভে এলিজাবেথীয় সাহিত্য, যন্ত্রযুগের সূত্রপাতে রোমান্টিক কবিতা, কিংবা রেফর্মেশন অথবা উদার গণতন্ত্রের যুগে মানুষের চিন্তা কল্পনা। বিচার বোধ

দুঃসাহসের ব্রত করেছে। সে-সময় মানুষ সকল শিকল ছিঁড়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজের সেই বিপ্লবী ও প্রগতিপন্থী ভূমিকা বর্তমানে স্তিমিত হয়ে এসেছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও সেই ভূমিকায় সাহস সঞ্চারণে সক্ষম হচেছ না। তার দরুন সংস্কৃতিকে এখন আশ্রয় খুঁজতে হচেছ। বাংলা সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক যে-ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে সেখানেই তার আশ্রয়।

সংস্কৃতি অর্থনৈতিক/সামাজিক ব্যবস্থার নিখুঁত কিংবা আয়নার মতন প্রতিফলন নয়। সংস্কৃতির একটা পৃথক সত্তা, সম্ভাবনা, বিশেষ ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত-শাসন আছে, কিন্তু তাকে তাল রেখে চলতে হয় অর্থনৈতিব/সামাজিকধারার সঙ্গে। তাল না মেলানোর অধিকার সংস্কৃতির আছে, তাতে লোকসান সংস্কৃতিরই। ভবিষ্যৎ গ্রহণ সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন ওঠে তাদের মধ্যে আছে পুরাতন অথবা নূতনের মধ্যে বাছাই কিংবা সমস্যা এড়ানো অথবা বুদ্ধি বিবেক বিচার-বোধকে সুবিধাবাদে আচছন্ন করা। এভাবেই যোগ ঘটে সমাজের গতির সঙ্গে সংস্কৃতির সংকটের।

বর্তমান সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচেছ; শ্রেণী প্রবল হচেছ; পরিবর্তন নাকি বিপ্লব আসন্ন। বিচার ও নীতির দোহাই দিয়ে নূতন চিন্তাস্রোত যদি প্রতিহত না করা যায় সেক্ষেত্রে পুরাতনপন্থীরা/সরকারস্বার্থসংশ্লিষ্টরা সংস্কৃতিকে কয়েদ করার উদ্যোগ নিতে পারে কিংবা সংস্কৃতিকে উগ্র জাতীয়-তাবাদী করে তুলতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদের লক্ষণ হচেছ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য। জাতীয়তাবাদ প্রবল ও বলীয়ান করার অর্থ হচেছ ঐ ঐক্যের বিরোধী সব ধারা/মত/চিন্তা নষ্ট করে দেয়া।

ঐ সবের অর্থ হচেছ ব্যক্তিবিশেষকে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা। নায়কসর্বস্ব ইতিহাস/সমাজ আসলে ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র। ঐ ধারণায় সমগ্রের বদলে খণ্ডের ওপর জোর দেয়া হয়। নায়কের চিন্তা ইতি-হাসের পরিচালক যদি হয় তাহলে ইতিহাসের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, ঐ চিন্তার ওপর পরিবেশ, ঘটনা, অবস্থার প্রভাব হ্রস্ব হয়, ঐ বিচারে নায়কের কর্মের সঙ্গে অন্যের অবদান ও অনুকূল অবস্থার যোগাযোগ হয় উপেক্ষিত। আসলে মহান ব্যক্তি নিঃসঙ্গ নন, নির্জন গিরিশিখরে তাঁর অবস্থান নয়, ইতিহাসে একজনই কর্তা বাকীরা অনুসারী কিংবা নিষ্ক্রিয় নয়।

সংস্কৃতি কি ঘটনা পরম্পরার স্রোত? কিংবা আমাদের মনের কল্পনা? দুইয়ের কোনটিই নয়। সংস্কৃতির বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার বিবরণী নয়; ঘটনাস্রোতের সাধারণ রূপ নির্ধারণ। সেই নির্ধারণ ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা,

কিংবা স্বপ্ন কিংবা জাগরণের বিলাস নয়, বাস্তব/মনোজীবনের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার মূল্য/তাৎপর্য সমান নয়, তার দরুন বিচার বিশ্লেষণ বর্জনের প্রশ্ন জরুরী। সমাজের রূপান্তরেই সমাজের গতি, সেই রূপান্তরের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণই সংস্কৃতির প্রাণ।

সংস্কৃতির ধারা ও পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে উৎপন্ন হয় না। মানুষ অন্য কোন-শক্তির পুতুল নয়; বাস্তবজীবনের বিভিন্ন বিরোধী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেই সংস্কৃতি রচনা করে। সংস্কৃতির গতি আকস্মিক এ ধারণা যেমন সত্য নয় তেমনি সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক শক্তি একমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রভাব, জাতিগত চরিত্র নয়। ঐসব প্রাকৃতিক/নৈসর্গিক/স্বাভাবিক শক্তিগুলির অপরিবর্তন সত্ত্বেও বাংলা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও রূপান্তর স্পষ্ট, সোচচার। সংস্কৃতির যাত্রা নানা সংঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। ঐ সব অ-সামাজিক কোন-শক্তির উপঢৌকন কিংবা কোন প্রবল ব্যক্তির খেয়াল নয়। মানুষের কাজের পশ্চাদপট হচেছ বাস্তব অবস্থার চাপ। সংস্কৃতি চর্চায় ঐ বাস্তব অবস্থার চাপ অনুশীলন সম্ভবপর, বর্তমান পর্যায়ে জরুরী।

ঐ চর্চার প্রথম শর্ত হচেছ ঘটনাবলী সংগ্রহ করা। এ ক্ষেত্রে বাছাইয়ের প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ও কার্যকারণ খোঁজা, ঘটনার ফলাফল নির্ধারণ, ঐ বাছাই থেকে অনিবার্য হয়ে ওঠে মূল্যবিচার। মূল্যবিচার ক্ষেত্রে বহু স্তর আছে। ঐ বিচারের মান নৈতিক নয়, ঐতিহাসিক-সামাজিক; এ ক্ষেত্রে কোন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরপারে পৌঁছানো সংস্কৃতিজীবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বিচারে দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য, কিন্তু সব দৃষ্টিভঙ্গি কি সমান মূল্য, সবই কি সমান সত্য সমান মিথ্যা? এ ক্ষেত্রে দেখা দেয় দৃষ্টিভঙ্গির বিচার, ঘটনাবলীর মূল্যবিচার থেকে দৃষ্টিভঙ্গির বিচার। সংস্কৃতিচর্চার দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতিবেশীত্ব এক্ষেত্রেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে আপেক্ষিক সত্যাসত্যের উদ্ভব হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রকৃত/যথার্থ সত্যের দাবিদার নন। সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও তাই। শুধু তফাৎ এটুকু: সংস্কৃতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বেশীমাত্রায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল, আর পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

তার দরুন সংস্কৃতি চর্চার প্রথম শর্ত হচেছ বাস্তব ঘটনার নির্ধারণ; দ্বিতীয় শর্ত হচেছ ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যবিচার; সেই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সতর্কতা; তৃতীয় শর্ত হচেছ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনামূলক বিচার। ভবিষ্যতের বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় ঐ তিনটি শর্তের প্রয়োজন জরুরী।

যামিনী রায়

যামিনী রায় ফিরে ফিরে এসেছেন তাঁর উৎসে। ঐ উৎস লোকজ ঐতিহ্য ; ঐ ঐতিহ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর প্রতিভার নিয়মে, উল্লিখিত করেছেন ঐতিহ্যের নানাদিক রং ও রেখার সমস্যার মধ্যে, উন্মোচিত করেছেন ঐতিহ্যের সম্বন্ধ প্লাষ্টিক ফর্মের সঙ্গে। ঐ দীর্ঘ অভিযানে তিনি এক ক্লান্তিহীন বীর, অনবরত লড়াই করেছেন আবিষ্কৃত দেশজ ঐতিহ্যের চরিত্র নিয়ে। বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে বিপ্লবের অভিঘাত এসেছে ইংরেজ আমল থেকে। ঐ অভিঘাত থেকে জন্ম নিয়েছে বিশ্লেষণের যন্ত্রণা, আত্মমর্যাদার আততি, চোখের দেখা মানুষের নিসর্গের সঙ্গে অতীতের কীর্তির ; এসেছে নানা রীতির মিশ্রণ, বিভ্রান্ত ভাব ; এসেছে মনে আর মননে স্বদেশ ; মুখোমুখি হয়েছে য়ুরোপ।

যামিনী রায়ও মুখোমুখি হয়েছেন য়ুরোপের, ঐ মুখোমুখি হওয়ার পথেই আবিষ্কার করেছেন দেশকে ঐতিহ্য, বিশ্লেষণ করেছেন য়ুরোপীয় সংঘাতের জের, সমাধান খুঁজেছেন দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে চিত্রশিল্পের দ্বন্দ্বের। ঐতিহ্যের প্রয়োজন তাঁর কাছে আত্মসম্মানের সমান্তর, সেজন্য তাঁর উৎসাহ ঐতিহ্যের খণ্ডাংশে নয়, অজন্তা কোনারককে নয়, তাঁর উৎসাহ বরং লোকজ জীবনে, যে-লোকজ জীবনের পরতে-পরতে গেঁথে আছে স্মৃতি আর পুরাণ, লোকাচার আর রীতিনীতি, কারিগরের অভ্যাস আর স্থির নিশ্চিত রেখার টান। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলের আকাডেমিক রীতি তাঁকে সচেতন করেছে রেঁনেসা স্থষ্ট নিশ্চল দর্শকের চোখে প্রতিভাত একক স্থির বস্তু দেখার বোধ কিংবা ড্রইং ক্লাস দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে। লোকজ ঐতিহ্য মূলত ফিগরটিভ, চিত্র ফর্মের ডিজাইন, রং কড়া ; বিষয় রং ও রেখার মধ্যে অন্তরিত, চিত্র আখ্যানধর্মী। চিত্রিত রেখা সংহত, ফিগরে উচচকিত জ্যামিতিক রূপ, চিত্রিত বিষয় বাস্তবের ইঙ্গিতবহ কল্পনার মুক্তিবহ, এভাবে

সোচ্চার হয় বস্তুর অভ্যন্তরীণ সত্তা, রেখার অনিবার্যতা ; চোখের চেনা বাস্তব, অলঙ্কার, নানা বিভ্রান্তিকর উপকরণ অনাবশ্যক ; যামিনী রায় লোকজ ঐতিহ্যের স্বরূপ আবিষ্কার করলেন এভাবেই, লোকজ চিত্রের সমস্যা ধরতে পেরে নিজের প্রতিভার নিয়মে ব্যবহার করলেন এভাবেই।

তিনি বহু বছর কাজ করেছেন আকাডেমিক রীতিতে ; ঐ সব কাজ নিশ্চিত ভাবেই প্রশংসা কাড়ে ; কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন ঐ রীতির অসারতা, ফিরে গেলেন ড্রইংএ, দেশী পুতুল ও লোকচিত্র করেছে তাঁকে সাহায্য ; সরল রেখার শক্তি, গতি প্রসার নিয়ে করেছেন পরীক্ষা, সেই সঙ্গে পরীক্ষা করেছেন চিত্রের রং, আলো, অন্যান্য উপাদান নিয়ে ; ঐ পরীক্ষার জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি আবিষ্কার করেছেন দুই পৃথিবীর পুরাণ : কৃষ্ণলীলা আর যীশুখৃষ্ট ; উদ্দেশ্য হয়তো প্রতীক তৈরী করা কিংবা উন্মোচিত করা শিল্পের নানা প্রত্যয় ; পুরাণের পরপারে ফের তিনি এসেছেন সাধারণ জীবনযাত্রায়, মানুষে, বিশাল ব্যাপক জীবনের মেয়ে-পুরুষে, চাষীতে, হাতি-ঘোড়ায় ; ফাঁকে ফাঁকে তর্জমা করেছেন নানা দেশের চিত্র পদ্ধতি, হয়তো আবিষ্কারের আবেগেই কিংবা নিজের সিদ্ধিকে বারেবারে অতিক্রমণের ইচ্ছায়ই।

আকাডেমিক রীতির অসারতা তাঁকে সচেতন করেছে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলের শেখানো দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে। ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে য়ুরোপের একটি পর্বের চিত্র বোঝা যায়, কিন্তু নানা রীতির কাজ বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে কলকাতার বানানো মধ্যবিত্তের জগতে ঐ পশ্চিমা একটি পর্বের চিত্রের অভিঘাত তৈরী করেছে অনুকরণের রুচি, বলীয়ান শিল্প প্রেরণার অভাব। যামিনী রায় যে-সমাজ থেকে কলকাতায় এসেছেন বাঁকুড়ার সেই গ্রামীণ সমাজ বাংলা সমাজই, সেখানে বানানো মধ্যবিত্ত জগৎ অনুপস্থিত, সেখানে জীবনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিসর্গ স্মৃতি আচারের পটে নিবিড়। এভাবেই আকাডেমিক রীতি তাঁকে সচেতন করেছে বানানো চিত্রধারার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে, অন্য পক্ষে ঐ রীতি তাঁকে শিখিয়েছে দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান ; রেখা সংক্ষেপের অভিজ্ঞতা। ঐ জ্ঞান তিনি ব্যবহার করেছেন জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে বারবার, ঐ অভিজ্ঞতা তিনি ব্যবহার করেছেন চিত্রের সমস্যা সমাধানে ফিরে ফিরে।

আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যা এবং রংয়ের সমস্যা তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে ঐতিহ্যে, পুতুলে, লোকচিত্রে। বাংলার পুতুল ঋজু, নিশ্চিত, সরল ;

তিনি পুতুলের ঐ গড়ন থেকে শিখলেন ভাস্কর্যধর্ম, প্রতিষ্ঠা করলেন ফিগর কিংবা আকৃতি ছবির মধ্যে চারপাশে ফাঁক রেখে, ফিগরের সঙ্গে ফাঁকা জমির সম্পর্ক তৈরী হল, এভাবেই তাঁর ছবিতে দেখা দিল ভাস্কর্যসুলভ দ্যোতনা। কিন্তু তাঁর অন্বিষ্ট ছবিতে স্থাপত্যের গুণ আনা, ঐ গুণ ব্যবহার করে ভিন্নতর সিদ্ধি জয় করা। সেজন্য এর পরে তিনি ছবিকে ফ্রেমে বেঁধে ফেললেন, ছবিতে দেখা দিল স্থাপত্যের গুণ, ফিগর ও ফ্রেম দুই মিলে ছবিতে নিয়ে এল স্থাপত্যধর্মী ভাস্কর্যের গুণ। পরের পর্যায়ে ঐ ফ্রেম তিনি দিলেন কেটে, ফিগরের প্রতিষ্ঠা কিংবা ফিগর ছড়ানো ফ্রেম পেরিয়ে, দেখা দিল বৈষম্য, নাকি বিপ্লব, ভারসাম্য খোঁজা দরকার হয়ে পড়ল অসম আকারে, রেখা থেকে গতির প্রসার হল এবং ঐ গতির প্রসার হল একটা চলিষ্ণু, বিন্দু থেকে, যামিনী রায়ের ছবি কেন্দ্র, ভিত্তি, ভূমি হয়ে উঠল ঐ চলিষ্ণু বিন্দু, ঐ চলিষ্ণু বিন্দুকে তিনি ব্যবহার করেছেন নানাভাবে সারা জীবন ধরে। ঐ চলিষ্ণু বিন্দু তাঁর আর লোকচিত্রের মধ্যেকার তফাৎ, তাঁর রেখার ব্যবহার প্রতি পর্যায়ে নূতন ভারসাম্য তৈরী করে, তাঁর রেখার ব্যবহার সেজন্য সচেতন, পরিকল্পিত, উদ্দেশ্যবহ।

রং ও রেখার ব্যবহারে ঐ পরীক্ষার ভিন্নতর সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে চলেন। শাদা স্পেসের মধ্যে তিনি নানা রঙ্গীন কণ্টুরে ফিগর আঁকেন, বাদ দেন বাহুল্য, অলঙ্কার ; এভাবে ফিগর হয়ে ওঠে সংহত, সরল, যেন ফিগরে উচ্চারিত অন্তর্নিহিত জ্যামিতি। কিন্তু রংয়ের অভাবে সুডৌল রেখা সত্ত্বেও তাঁর ছবি হয়ে উঠল রেখাধর্মী, কণ্টুর ও স্পেসের জন্যই। পরে তিনি ব্যবহার করলেন রং, আলো, ডীপ স্পেস ; মা শিশু হরিণের সুডৌল রেখার গীতি কবিতার বদলে দেখা দিল গোপিনী চিত্রাবলী, রামায়ণের চিত্রাবলী, রং চাপ চাপ সমান উজ্জ্বল, মধ্যে আলো মোটা রেখায়, চোখের শাদায়, ঈষৎ হলুদে, রেখায় উচ্চারিত হল শক্তি আর জমিতে আততি। কখনো বা রং এর ফাঁকে ফাঁকে আলো ; সেই সঙ্গে সরল রেখা শক্তিমান হয়ে ওঠে, যেন গতি দীপ্ত, প্রসার দ্বিধাহীন, অথচ সরল ; বাঁকা রেখাও সম্পূর্ণতা খুঁজে চলে। সে জন্যই তাঁর পুরুষ কিংবা মেয়ের শিরদাঁড়া খাড়া, সোজা, কাঁধ জোরালো, চোখ পটল চেরা ; রেখা তাই অনবরত তীব্র, স্পন্দমান।

ঐ পরীক্ষার জ্ঞান থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন দুই পৃথিবীর পুরাণ : কৃষ্ণ বলরাম আর যীশুখৃষ্ট ; ঐ দুজন প্রতীক কিংবা লোকজ জীবনের দৃশ্য, অনুষ্ঠান ; জীবনের মধ্যেই তাদের উৎস, তাঁরা মিলে মিশে যায় সাধারণ মানুষের

ক্রিয়াকর্মে। ফিগর বিশালকায়, সেই সঙ্গে অলঙ্করণ ; তিনি মিলিয়েছেন বাঁকা রেখার সঙ্গে ফর্ম, মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন আলঙ্কারিক উপাদান, ঘুরে ঘুরে। তিনি খুঁজেছেন ডীপ স্পেসের মায়া, এবং ফ্ল্যাট জমির মধ্যেকার সঙ্গতি, সেজন্য তিনি জোর দিয়েছেন অলঙ্করণে এবং বিপরীতে সরল করেছেন ফর্ম।

পুরাণের পৃথিবী ছেড়ে তিনি ফিরে আসেন জীবনে, এঁকে চলেন সাধারণ মানুষ, মেয়ে-পুরুষ, চাষী, সাঁওতাল, ঘোড়া কিংবা গরু ; জীবনের এক একটা টাইপের মধ্যে গেঁথে দেন সংহতি, স্থির নিশ্চিতি, ঋজু, তীব্র, স্পষ্ট ; সময়ের পরপারে তাদের অবস্থান। সাঁওতালের মাথা, দুই বৈষ্ণব, কিংবা লাল ঘোড়া কিংবা কনে কিংবা রথে রাজা-রাণী, সবই টাইপ, সেই সঙ্গে সবই চেনা ; লালচে ব্রাউন সাঁওতালের মাথা মনুমেণ্টাল ; দুই বৈষ্ণবে উজ্জ্বল, নিষ্কম্প সমান আলো, লালচে ব্রাউন জমিতে লাল ঘোড়ার সংহত রূপ ও আবেগ ; কিংবা কনেতে আর্কিটেকটনিক রেখা ; কিংবা রথে রাজা-রাণী রং ও রেখার এক অখণ্ড ডিজাইন। কিংবা সাঁওতাল মা কোলে শিশু, হলুদ পটভূমি, মার উর্ধাঙ্গ লালচে ব্রাউন, চোখ শাদা, লালচে ব্রাউন ডান হাতে নীল শিশু, সিঁদুর শাড়ি ; ঐ রং প্রবিষ্ট রেখার মধ্যে, ঐ রেখা বিষয়ের মধ্য থেকে শরীরের বাঁকাচোরা, সুডৌল গড়নটি তুলে ধরে, নক্সার ঐক্যে ও নির্মাণের মধ্যে দিয়ে ফর্মটি গড়ে তোলে, স্পষ্ট, বাঁবা কণ্টুর মাথা থেকে নিচ পর্যন্ত সাবলীল, ঐভাবে গড়ে তোলে শক্তি ও প্রাণের দ্যোতনা। অথবা মেরী ও খৃষ্ট ছবিতে উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ, স্থির, উজ্জ্বল আভা ; রং ও আলোর বনেদী কমনীয়তা।

যামিনী রায়ের কাজে বিচ্ছুরিত সুষমা, শুদ্ধতা, শান্তি। ঐ লক্ষ্যে তিনি পৌঁছেছেন প্রায় সরল রং, স্থূল কিন্তু বলিষ্ঠ ফিগর এবং রেখার আলঙ্কারিক ঐক্যের মধ্যে দিয়ে। ঐ সবকিছু মিলিয়ে দেয়া হয়েছে এক মনুমেন্টাল ষ্টাইলে, ঐ ষ্টাইল একত্র করেছে ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকাশভঙ্গি আর মার্জিত রুচি-বোধ, স্থূল বলিষ্ঠ প্রত্যক্ষতা আর নন্দনতাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা। পরিবৃদ্ধির পথে তাঁর উৎসাহ বেড়েছে অলঙ্করণের দিকে, রংয়ের নরম নমিত দীপ্তির দিকে। তাঁর কাল যখন ধ্বংসের আঘাতে নড়বড়ে তখন তিনি তাঁর কাজে তুলে ধরেছেন শান্তির নিশেন। শান্তি কিংবা শুদ্ধতা জীবনের মূল্যবোধের ইঙ্গিতবহ, ঐসব মূল্যবোধের অবস্থান ইতিহাস-সময়ের পরপারে। মন ও অনুভূতির কাছে আবেদনমুখর ছবি তৈরী করা এক হিসেবে সংকটকালে মানবিক মূল্য বোধ সংরক্ষণেরই অন্য প্রয়াস। যামিনী রায়ের কাজের ভিত্তি

ও ভূমি নিসর্গ আর দৃশ্যমান পৃথিবী। ঐসব থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন সভ্য এক শান্ত শিল্পের দ্বীপ, ঐ দ্বীপের চারপাশে আতঙ্ক ঝড় অভাব অনটন। লক্ষ্য তাঁর শান্তি, সেখানে তিনি পৌঁছেছেন চলিষ্ণুভাবেই ; তিনি অনবরত পরীক্ষা করেছেন, অতৃপ্তি তাঁকে অবিরল চঞ্চল করেছে, বাদ দিয়েছেন সরল সমাধান। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে ত্যাগ করেছেন আকাডেমিক সিদ্ধি, পরীক্ষা করেছেন ফর্ম নিয়ে, রেখা ও রংয়ের সম্পর্ক নিয়ে ; কৃষ্ণলীলার ফ্রিজে প্রবিষ্ট করিয়েছেন বাঁকা এবং কৌণিক ফিগরের ছন্দ, এভাবে তৈরী হয়েছে রাজকীয়তা এবং সরলতা। যামিনী রায় প্রয়াস করেছেন ভল্যুমকে রং ও ফ্ল্যাট ডিজাইনের সীমানার মধ্যে নিয়ে আসার। ঐ সমস্যার সমাধান তিনি করেছেন রং-এর সঙ্গতি এবং রৈখিক অলঙ্করণের মাধ্যমে। সারা জীবন ধরেই তিনি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন চিত্রগত সমস্যার ব্যাপারে ; সংকটকালে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অতি পরিশীলনের বিপরীতে বলিষ্ঠ স্থূলতা ও সরলতার দিকে। সবসময়ই তিনি উপদেশ চেয়েছেন দেশজ সংস্কৃতি থেকে, জোর দিয়েছেন প্রকাশভঙ্গিমতার ওপর নয়নসুখকর অলঙ্করণের চেয়ে। তাঁর ফর্মে তাই মিলেছে ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রবণতা। তিনি নিসর্গে নাকি ঐতিহ্যের কাছে গেছেন অনুভূতির ছাপের জন্য, কিন্তু তিনি পেয়েছেন খুঁজে এক ফর্ম-ভাষা, ঐ ফর্ম-ভাষার সঙ্গতি আছে অনুভূতির অধুনা রীতির সঙ্গে। তিনি শিল্পের বহু দরজা খোলেননি, কিংবা পরিভ্রমণ করেননি অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিরোধী গভীরে। তাঁর শক্তি তাঁর সীমাবদ্ধতা : তাঁর মার্জিত বোধ, তাঁর প্রকাশভঙ্গিমতার সঙ্গে রুচির সঙ্গতি, বাস্তব থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে তাঁর অসম্মতি ; ঐ সীমাবদ্ধতা মেনেই তিনি অভিযান করেছেন চিত্রশিল্পের ভাষার সম্ভাবনা আবিষ্কারে, ঐ তাঁর কৃতিত্ব, সিদ্ধি, তাঁর জয়ের নিশেন।

স্থাপত্যের সমাজতত্ত্ব ঃ বাংলাদেশ

দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সমাজটা স্বাধীন হয়নি। সমাজটা ভাঙ্গাচোরা, পতনের বীজ ভরা, সমাজের বাসিন্দাদের ধ্যানধারণা পুরানো, পরীক্ষা-বিমুখ; উৎপাদনরুদ্ধ কৃষি অর্থনীতিভিত্তিক সমাজটার ওপর ফের প্রবল অভিঘাত পড়ছে যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার; উচচাশাসম্পন্ন ও চেষ্টা পরায়ণ শিক্ষিতদের স্বার্থের সঙ্গে লোকসাধারণের দ্বন্দ্ব চলছে, ঐ সব মিলিয়ে যাত্রা চলছে ফের সমাজতন্ত্রের অভিমুখে।

সমাজের মধ্যে ধ্বনিত হচেছ তাই বিভিন্ন কোরাস, সৃজনশীল ও স্থাপত্য-প্রেমিক ব্যক্তিরা যোজনা করছেন নিজেদের কণ্ঠ, ঐ সব তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত উচচারণ। তাঁরা সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, সেখানে সঞ্চিত আছে ইসলামী ও মধ্য-ভিকটোরীয় ইংল্যাণ্ডের স্থাপত্যের ধারণা, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, সেখানে অপেক্ষা করে আছে অন্ধকার। এ সবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের এই ইচছাটা ফুটে বেরোচেছ যেন অন্ধকার নিবারিত হয়, যেন অন্ধকারের বীজ থেকে বাংলাদেশ উদ্ধার লাভ করে। সেজন্য স্জনশীল স্থপতিরা স্বদেশে প্রবাসী কিংবা উদ্বাস্তু, কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন থেকে তাঁরা বঞ্চিত, নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনবরত নিজেরাই খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। তাঁরা দেখছেন সমাজে বস্তা পচা ধ্যান-ধারণা উপস্থিত ও স্বীকৃত, আর তাঁদের জীবনলিপ্সার উল্টো পিঠে প্রস্তুত সরকারী অনীহা। আর, তাঁরা আধুনিক পৃথিবীর অনবরত নির্দেশপ্রার্থী ও নির্দেশপ্রাপ্ত; তাঁরা নিজেদের পথ তৈরী করতে উদ্যত হচেছন বহু সংশয় পেরিয়ে, বহু ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে, একটি উপলব্ধির শিখর পর্যন্ত। হয়তো এমনি স্জনশীলতার সম্পূর্ণ বৃত্ত, ধ্যানের পরম্পর, জনন ও জন্মের স্বরূপ ও বৃদ্ধি।

ঐ তথাকথিত ইসলামী কিংবা মধ্য-ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের স্থাপত্যরীতির টিকে থাকার কারণ বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি।

আফগান, মোগল, পরবর্তীকালে ইংরেজ অভিঘাত বাংলাদেশে প্রবল ও বলীয়ান তরঙ্গ তৈরী করেছে, ঐ সব জয়ী সমাজের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ বিজিত বাঙালীর সামাজিক শ্রেণী ও লোকসাধারণের কাছে আদর্শ ও অনুকরণের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ঐ আদর্শের বন্দনা, ঐ অনুকরণ-স্পৃহা সবসময় সচেতন নয়, কখনো-কখনো সামাজিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান থেকে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে তুলনামূলক বিচার ঘটে থাকে। ঐ কারণেই বাংলাদেশের স্থাপত্যে আফগান, মোগল কিংবা য়ুরোপের প্রভাব বিশাল ও বিপুল ; ঐ প্রভাব সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের মনোরম উদাহরণ। কৃষি-নির্ভর বাংলা সমাজের গ্রামাঞ্চলের বাড়িঘর নিসর্গের মধ্যে অনুজ্জ্বল ভাবে শনাক্ত, বাড়িঘরে উপস্থিত সামান্য জীবন যাপনের স্বীকৃতি। শহরাঞ্চলের বাড়িঘরে তথাকথিত ইসলামী ও মধ্য-ভিকটোরীয় স্থাপত্যের নিশানা, উচ্চকোটির ঐ সাংস্কৃতিক কানুন সমাজে ছড়ানো, মানুষের মনের পরতে-পরতে প্রবিষ্ট, তাই ঐ স্থাপত্য টিকে থেকেছে। সমাজটা বদ্ধ, টেকনোলজির দিক থেকে পঙ্গু, তার দরুন প্রয়োজন কিংবা ঐতিহ্য ও লোকাচার আরোপ করেছে ইচ্ছা ও উপাদানে নির্বাচনের সীমিতি, ঐ সীমিতির প্রভাব পড়েছে নির্মাতাদের মনে, সেই সঙ্গে পড়েছে ফর্মের ওপরেও। বাংলাদেশের আধুনিক কালে সুপ্রাচীনতার জের ঐ কারণেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে আধুনিক স্থাপত্যের অভিঘাত পড়েছে। ঐ অভিঘাত থেকে জন্ম নিচ্ছে বিশাল ও বলীয়ান মতাদর্শগত আন্দোলন। সিমেণ্ট ও স্টীলের ব্যবহার এবং প্রকৌশলী বিদ্যায় অগ্রগতি ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ-পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক রূপান্তর এনেছে। কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে যন্ত্রযুগের প্রভাব দুটি সমস্যা তৈরী করেছে : কারুকর্মে সংকট এবং শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন সঙ্গতিসাধনের প্রয়োজন। ঐ সংকট থেকে উদ্ভূত হয়েছে বিরোধী দুই ধারণা : স্থাপত্য হচ্ছে মূলত আলঙ্করিক কিংবা স্থাপত্য হচ্ছে সরল অনালঙ্করিক ফলিত কাজ। দুই বিরোধী ধারণা জোর দিয়েছে কাঠামো এবং অলঙ্করণের ঐক্যের ওপর, সে-অলঙ্করণ কাঠামোতে অন্তরিত হোক কিংবা উল্টোটাই। অবশ্য দুইয়েরই সাধারণ শত্রু হচ্ছে আকাডেমিক স্থাপত্য, যে-স্থাপত্য কোন-একটি ঐতিহাসিক স্টাইলের অনুকরণ কিংবা গুটিকয় স্টাইলের সমাবেশ।

যন্ত্রের অব্যাহত প্রভাবের দরুন অলঙ্করণ ও কাঠামোর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে স্পেস ব্যবহারের জন্য

নির্মাণের নূতন পদ্ধতির অন্তর্গত সম্ভাবনাকে বড়ো করা হয়েছে, যেন স্পেস হচ্ছে যন্ত্র সভ্যতার তীব্র তীক্ষ্ণ জীবনপ্রবাহের ভিন্ন এক আয়তন বিশেষ। ঐ থেকেই স্থাপত্যকে দৃশ্যমান বাস্তব হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা এসেছে। স্থাপত্য তাই হয়ে উঠেছে জমিন, ম্যাস এবং শূন্যতার এক সমাহার। জমিন, ম্যাস এবং শূন্যতাকে বিশুদ্ধ ও নিরঙ্কুশ মূল্যবোধে নিষিক্ত করার জন্য দরকার স্থানিক গতানুগতিকতা বাতিল করা। তার দরুন ফর্মকে নিজের সম্পর্কে এবং কাজের দিক থেকে বিবেচনা করা জরুরী। সমস্যাটা স্বভাবতই বাস্তবিক, সেজন্যই সমাজের পরিপ্রেক্ষিত এসে গেছে। স্থাপত্যের ঐ রুচিবোধ নির্মাণের অর্থ সমাজের রুচিবোধ বদলে দেয়া। ঐ রুচি যন্ত্রযুগের, কিন্তু যন্ত্রযুগ ইতিহাসের প্রগতির একটা অধ্যায়, শেষ নয়। এভাবে স্থাপত্য হয়ে উঠেছে রুচির দিক থেকে আন্তর্জাতিক, সেই সঙ্গে উত্তম সমাজগঠনের যন্ত্র বিশেষ। সেজন্য কি স্থাপত্য এখন সমষ্টিবদ্ধ চেতনা প্রভাবিত করছে, সেইসঙ্গে প্রগতির প্রক্রিয়াকে এগিয়ে দিচ্ছে? দুটি বিশেষ প্রত্যয় ঐ রুচিবোধে অন্তর্গত: যৌক্তিকতা এবং এক-মান নির্মাণ। স্থাপত্য তাই বিশুদ্ধ ফর্ম, সম্পূর্ণ এক রূপকল্প; যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এবং নিরঙ্কুশ সুচারুতায় ঐ ফর্ম গড়ে তুলতে সক্ষম। প্রকাশভঙ্গিমার একটি সম্পূর্ন পদ্ধতি হিসেবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর অমন গুরুত্ব আরোপের দরুন বাতিল হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তিক অনুভূতি, আবেগ এবং প্রকৃতির অনিশ্চয়তাবোধ। তাছাড়াও এবষ্টাকট ফর্ম কংক্রীটে পর্যবসিত হচেছ, ঐ ফর্ম জীবনের কোন প্রতিভূর সঙ্গে যুক্ত নয় কেবল, যুক্ত বরং জীবনের সঙ্গেই। স্থাপত্যের ঐ তত্ত্ব শিল্পের প্রত্যয়ে ভিন্ন এক অর্থ যোজনা করেছে, শিল্প হয়ে উঠেছে নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যমান। শিল্প নাকি স্থাপত্য একইসঙ্গে নৈতিক এবং তাত্ত্বিক, কারণ স্থাপত্য হচ্ছে জ্ঞানের এক ধরন, নৈতিকতা ও নন্দন-তাত্ত্বিকতার মধ্যেকার দেয়াল ভেঙ্গে যাবেই, ভেঙ্গে যাওয়া উচিত। ঐ স্থাপত্যের সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে আছে যান্ত্রিক সভ্যতা এবং তার শিল্প সম্বন্ধে কলকারখানাজাত পুরান; ঐ স্থাপত্য বুদ্ধিবাদী এক নির্মিতি, জীবনের মৌল সৃষ্টিশীল নিয়মের অংশভাগ নয়।

ঐ সব আইন স্পেসের এবষ্ট্রাকট আইন নয়, বরং পরিবৃদ্ধিমান জীবন কিংবা উদ্ভিদ কিংবা তরুর আইন। সেজন্য ঐসব ফর্মের আইন নয়, বস্তুর আইন। সেজন্য স্থাপত্যের প্রতিটি উপাদানের বিভিন্ন ব্যবহার জরুরী, ঐ উপাদানের স্বরূপ মেনে ব্যবহারের সম্ভাবনা তার দরুন অসীম। কোন একটি

উপাদানের উপযোগী ডিজাইন অন্যটির উপযোগী নয়, কারণ সরলতার আদর্শ সৃষ্টিশীল প্লাষ্টিসিটি হিসেবে। ঐ তত্ত্বের দিক থেকে ডিজাইন কিংবা প্ল্যান হচেছ শুদ্ধ জ্যামিতিক পদের ভিত্তিতে স্বাভাবিক উপাদানাবলীর নির্বস্তুকতা। এক্ষেত্রে য়ুক্লিডিয়ান জ্যামিতি অনুযায়ী জ্যামিতিক ফর্ম স্পেসের প্রকাশ মাধ্যম নয়, বরং জ্যমিতিক ফর্ম হচেছ বিশুদ্ধ মানসিক নির্বস্তুকতা, বাস্তবে প্রাপ্ত সৃষ্টিশীল ফর্মের সর্বোচচ মূল্যবোধের দিকে সচেতন পদক্ষেপ, ঐ ফর্মের দেখা মেলে সৃষ্টিশীল মনের মধ্যে।

এভাবেই, ঐ সব তত্ত্বের ভিত্তি ও ভূমি থেকে, স্থাপত্যের ফর্মের মধ্যেকার কাজ ও সৌন্দর্যের সম্পর্কের প্রণয়ন বাদেও স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার সম্পর্কের দিকটিও সোচচার হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ নগর পরিকল্পনাকে আদর্শ নগরের ভিত্তিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন; কেউ কেউ নগর পরিকল্পনাকে দেখেছেন মূলত সামাজিক সমস্যা হিসেবে, আর কেউ কেউ দেখেছেন প্রকৃতির সম্পর্কে মানবিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মের সমস্যা হিসেবে কিংবা ক্রমিক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিক স্বাধীনতার ফলশ্রুতির সমস্যা হিসেবে। কিন্তু ঐ সব তত্ত্বের সামাজিক অভিঘাত প্রবল, সেজন্য ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্থাপত্যের পক্ষে সম্ভব হচেছ সকল শিকল ছুঁড়ে ফেলার, ঐ সব শিকল স্থাপত্যকে এতদিন বাংলাদেশে কয়েদ করে রেখেছে।

বর্তমানে যাঁরা নগরপরিকল্পনায় হাত মক্স করছেন তাঁরা শহর গড়ে তুলছেন ধনী বাসিন্দাদের গ্রামের বাগান বাড়ির ঢংয়ে। সেজন্য ঢাকায়, ধানমণ্ডী কি গুলশানে দশকাঠা/এক বিঘা/দু বিঘার ছড়াছড়ি, বাগান বাড়ির মাপে ঘরবাড়ি উঠেছে; অথচ শহরে জায়গার অভাব, শহর বাড়তে পারছে না। অন্যদিকে শহরে ক্ষতের মতন বেড়ে চলেছে বস্তির পর বস্তি। এভাবেই শহরে তৈরী হচেছ বিভেদ: সামাজিক ও অর্থনৈতিক, তৈরী হচেছ সংকট নগর প্রশাসনে। সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিভেদ আর বস্তি হচেছ উজ্জ্বল নজির নগর পরিকল্পনার অবস্থার। সামাজিক, আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে শহরের কেন্দ্র তার সামাজিকীকরণ ভূমিকার অনেকাংশ হারিয়ে ফেলেছে, কারণ বস্তিতে কয়েদী মানুষেরা নাগরিক জীবনের প্রধান প্রবাহে শরিক হতে পারছে না। সেজন্য ঢাকা শহরে তৈরী হচেছ দুই বাংলাদেশ: এক বাংলাদেশের কেন্দ্র বস্তি, অন্য একের কেন্দ্র বাগানবাড়ির বাসিন্দারা, তৈরী হচেছ আর্থনীতিক ও সামাজিক বিভেদ, তৈরী হচেছ শ্রেণীযুদ্ধ। বৈপরীত্যের উল্টো দিকে আছে সারাদেশের জন্য যাঁরা পরিকল্পনা তৈরী করেন অতিমানব সেই

প্ল্যানিং কমিশনের কর্তারা। দেশ তাঁদের কাছে জি. এন. পি. সেভাবেই তাঁদের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গোটা মানুষ নয়, খণ্ড মানুষ দরকার, তার দরুন কি প্ল্যানিং কমিশনে অর্থনীতিবিদ্‌দের কায়েমী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে? নানা জ্ঞানকাণ্ডের লোকজনের সমবায় ও সহযোগিতার বদলে কেবল অর্থনীতিবিদ্‌দের রাজত্ব বলেই দেশের নীলনক্সায় মানুষ ছাড়া সবকিছুর উল্লেখ আছে। অথচ চাই গোটা মানুষ, মানুষের জন্যই সবকিছু, সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হোক ঐ সত্য।

গোটা মানুষ জীবন্ত মানুষের দরকারের জন্য শহর। সেই সঙ্গে একথাও বলা জরুরী: শহর নেহাৎই শিল্পকর্ম নয়, কখনোই নয়। শহর ও জীবনের অন্যান্য মণ্ডলের সমাবেশের জন্য শিল্প জরুরী, শিল্প আমাদের কাছে জীবনের ব্যাখ্যান তুলে ধরে, দেখায় জীবনের অর্থ, আমাদের পারস্পরিক জীবন এবং আমাদের ছাড়িয়ে যে-জীবন তার মধ্যেকার সম্পর্ক উদ্ভাসিত করে তোলে। হয়তো শিল্পের দরকার আমাদের মানবিকতা আমাদের কাছে ফের সুনিশ্চিত করে তোলার জন্য। জীবন ও শিল্প পরস্পর প্রবিষ্ট, কিন্তু জীবন ও শিল্প এক নয়। ঐ দুইয়ের মধ্যেকার বিভ্রান্তির দরুনই বোধ হয় অংশত নগর পরিকল্পনা অমন হতাশাব্যঞ্জক।

সব সময় এই সরল মিথ্যে কথা আমাদের শোনানো হয় যে শহর হচ্ছে শৃঙ্খলার এক প্রতীক। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজতম ব্যাপার হচ্ছে গুটিকয় ফর্ম আঁকড়ে ধরা, তাদের আরোপিত শৃঙ্খলা দেয়া, শৃঙ্খলার নাম করে তাদের চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। কাজের পদ্ধতিকে জটিল এক সংগঠন হিসেবে ধরে নেয়ার মধ্যে বোধের দরকার। হেমন্তে গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়, কিংবা প্লেনের ইঞ্জিনের অভ্যন্তর, কিংবা দৈনিক পত্রের ডেস্ক, সবই হিজিবিজি বলে বোধ হয় যদি ঐ সব না বুঝে দেখা হয়।

শহর আমরা ব্যবহার করে থাকি, তার দরুন শহর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বেড়ে চলেছে। দৃশ্যমান অবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয় বলেই বিভ্রান্তি দেখা দেয়। শহর সমাজেরই বিস্তৃতি, সেজন্য পরিকল্পনা দরকার, ঐ দরকার মানবিক দায়িত্ব বোধে আক্রান্ত। কিন্তু ঐ পরিকল্পনায় তিনটি উপাদান জরুরী: প্রয়োজনের সঙ্গে বৈচিত্র্য, প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য, প্রয়োজনের সঙ্গে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের উন্মেষ। প্রয়োজনের সঙ্গে বৈচিত্র্যের মিলন না ঘটলে দেখা দেয় ধূসর এক স্থাপত্যের নিসর্গ; প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন না ঘটলে দেখা দেয় কুশ্রী এক স্থাপত্যের চক্রান্ত;

প্রয়োজনের সঙ্গে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের উন্মেষ না হলে দেখা দেয় সমাজবিরোধী স্থাপত্যের একতা। তাৎক্ষণিকের চাপ প্রবল, ঐ চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করলে জ্যান্ত শহরের বদলে মৃত, বিবর্ণ, শ্বাসরুদ্ধকর এক বিশাল খাঁচা আমরা তৈরী করব, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকবে জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে। অথচ আমরা মানুষকে মুক্তি দিতে চাই অনন্ত বৈচিত্র্যে, স্বাধীনতা দিতে চাই অমর সৌন্দর্যে, ব্যক্তিকে গেঁথে দিতে চাই স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে সমাজে: নগর পরিকল্পনা তার প্রাথমিক শর্ত মাত্র, বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ; অগণিত মানুষের স্বাধীনতা সত্য করে তোলার উপায়। আত্মনির্ভরশীল ব্যবহারের এই জীবন্ত সংগ্রহ, এই স্বাধীনতা, এই জীবন আমাদের আরো বোধগম্য হোক। মানুষের স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক।

লেখকের স্বাধীনতা

লেখক কি স্বাধীন? লেখক কি পরাধীন? লেখক কি? এ জিজ্ঞাসা পরস্পর প্রবিষ্ট, এর জবাব লেখক খুঁজে চলেন সারাজীবন দিয়ে। লেখক, যিনি হৃদয় অবারিত করে সময়কে গ্রহণ করেন তিনি জীবন যাপন করেন সময়ের মধ্যেই। ঐ সময়ের রৌদ্র ও বৃষ্টি অন্ধকার ও আলোক তাঁর চোখে অবিরল জ্বলে। ঐ সময় তাঁকে সংলগ্ন করে তাঁর দেশের সঙ্গে, ফের বিরাট বিশ্বের সঙ্গে। সেজন্য তিনি বাসিন্দা দেশ ও দেশোত্তরের, তিনি নাগরিক দেশ ও বিশ্বের। তিনি, মানুষ, মনুষ্যত্বের খোঁজ করেন; তিনি, ফের, মানবিকতার ছাঁচে মানুষ খুঁজে চলেন। ঐ দ্বন্দ্ব তাঁর দৈনন্দিনে মানবিক সমগ্রতা এনে দেয়। ঐ সমগ্রতা বোধের আয়ত্তে আনার সমস্যাই তাঁর স্বাধীনতা কিংবা পরাধীনতা কিংবা তাঁর অস্তিত্ব। সেজন্য তিনি একা স্বাধীন নন কিংবা পরাধীন নন কিংবা তাঁর অস্তিত্ব একক যন্ত্রণা অথবা উল্লাসে বিধ্বস্ত নয়। তিনি সেজন্য যুক্ত, যুক্ত ঐ দৈনন্দিন মানবিক সামগ্রিকতায়।

লেখকের কাজ সাহিত্য, আর সাহিত্যের ঝোঁক স্বায়ত্তশাসনের দিকে, সেজন্য লেখকরা তাঁদের কাজে মর্যাদাবান করেছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। মর্যাদাবান ঐ ব্যক্তি ঐ মানুষের ওপর চাপ তৈরী করছে সমাজ। সাহিত্যের ব্যক্তিরা স্বাধীন মানুষে পরিণত হতে না পেরে পৌরাণিক নীতি প্রচারে কিংবা প্লটের সম্মোহনে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। সেকালের সাহিত্যে সামাজিক আবহাওয়া এভাবেই বেড়ে ওঠেছে। কিন্তু সাহিত্যের আত্মমর্যাদা বেড়েছে সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে। সেজন্য বর্তমানের সাহিত্যে প্রধান চরিত্র বা ব্যক্তি, সংলগ্ন আবহাওয়া প্রবল ও বলীয়ান। কিন্তু অধুনা সমাজ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, সেজন্য বর্তমান সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিদের স্বাধীনতা আভ্যন্তরীণ, অন্তরঙ্গ মনের ঐ স্বাধীনতা, অন্তিম বিশ্লেষণে, মনের খেলা।

মনোনির্ভর ঐ স্বাধীনতা মনোবিজ্ঞানের, নিরাকার জগতের, সেজন্য ব্যক্তির শেষ সন্ধান ব্যক্তিত্ব লোপে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব লোপ কিংবা নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের অন্বিষ্ট নয়। সাহিত্যের কাজ বাস্তবকে নিয়ে, আর বাস্তব ব্যক্তিটাকেই চায়, মানুষটাকেই, সেজন্য সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা বাস্তবচ্যুত হয়, তাদের বিকাশ শূন্যে, কল্পনার ফাল্গুনে, মনোজাত তাদের স্বাধীনতা বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা উপহার দেয়। ঐ উপহার খণ্ড চৈতন্যের, উপলব্ধির ব্যক্তিক ক্ষমতার।

কিন্তু লেখক ব্যক্তিটির স্বাধীনতার বোধ সাহিত্যের ঐ খণ্ড চৈতন্য, সেই সঙ্গে সমাজের প্রতিযোগিতামূলক ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা থেকে বেড়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্ট ব্যক্তি এবং তিনি, বাস্তব ব্যক্তিটি, দুই-ই সমাজের চাপে স্বাধীনতা খুঁজতে গিয়ে কখনো অসহায় কখনো বিদ্রোহী। তাঁর সৃষ্ট ব্যক্তি অর্থনীতির স্তর ছাড়িয়ে পৌঁছতে চায় মানবিক স্তরে, তিনিও, বাস্তব ব্যক্তিটিও, পৌঁছতে চান ঐ স্তরে, তখন লেখকের স্বাধীনতার সঙ্গে সাহিত্যের আত্মমর্যাদা একাকার হয়ে যায়, ব্যক্তি ও সৃষ্টির মধ্যে মেল বন্ধন ঘটে, বাস্তবিক ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অন্তরঙ্গ স্বাধীনতার সঙ্গে বাস্তবিক স্বাধীনতা অনবরত খুঁজে চলে। ঐ পথের ব্যারিকেড শ্রেণীগত জীবনযাত্রা, মানবেতর ভেদাভেদ, সম্ভব-অসম্ভবের মাপকাঠি। ঐ পথের প্রতিবন্ধক অর্থকরী বৃত্তির অসমান সুযোগ, অপ্রচুর অবসর, সংকীর্ণ সংস্কৃতির পরিসর, সেজন্য এক্ষেত্রে জীবন মূল্যবান নয় কিংবা প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ মর্যাদা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত কিংবা বিজ্ঞান জীবনের বিরোধী সত্য।

শ্রেণী বিচ্ছিন্ন সমাজে ব্যক্তির মানবিক স্তরে পৌঁছনোর ওপর চাপ আসে সমাজ থেকে রাষ্ট্র থেকে প্রচণ্ড ব্যাপ্তি নিয়ে। সমাজ ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত করে তোলে, রাষ্ট্র ব্যক্তিকে বান্দা বানাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। এভাবেই লেখক ব্যক্তিটি জীবিকার তাগিদে সমাজের মধ্যে নিজেকে লুপ্ত করে এবং এভাবেই লেখক ব্যক্তিটি জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্য রাষ্ট্রের হুকুম মেনে নেয়। এ অবস্থায় লেখকের স্বাধীনতা অর্থনীতির স্তর ছাড়িয়ে মানবিক স্তরে শিখা ছড়াতে পারে না। লেখকের স্বাধীনতা মানবিক স্তরে পৌঁছবার স্বাধীনতা, যেখানে বিভিন্ন জ্ঞানকাণ্ডের নির্মাণ কাজ মানুষকে নিয়ে, যেখানে জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অর্থোত্তর মানব সমাজে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, সাহিত্যের স্বাধীনতা আর লেখকের স্বাধীনতা আরো জ্ঞান আরো অ ভবশক্তি মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের উপহার দেয়।

লেখক তাঁর স্বাধীনতায় পৌঁছান দৈনন্দিন মানবিক সমগ্রতায় নান্দনিক অভিজ্ঞতার পরিপূরণে সমাজ ইতিহাস রাজনীতির বহু জিজ্ঞাসায় নিজেকে শাণিত করে। এ ভাবেই তিনি জানেন, বোঝেন, অনুভব করেন স্বাধীনতা সামাজিক মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতির মধ্যে ; ঐ জানা, বোঝা, অনুভব করা তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে বর্তমানে, অর্থনীতির পরের স্তরের মানবজীবনের অন্বেষক করে তোলে, তিনি হয়ে ওঠেন ভবিষ্যতের কণ্ঠ, অতীত চৈতন্যের বিস্তৃতি। অভিজ্ঞতার ঐ বিস্তার তাঁকে স্বাধীন করে তোলে, তাঁর মনের মুক্তি তাঁকে কর্মের জগতে নিয়ে যায়, সৃষ্টির ভুবনে নিয়ে যায়, সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেন বর্তমানের, নিশেন তোলেন ভবিষ্যতের, নান্দনিক অভিজ্ঞতায় অতীতে জেলে দেন বোধের দীপ্ত শিখা। তখন তাঁকে ছাঁচে ফেলার জন্য এগিয়ে আসে সমাজ। রাষ্ট্র, তাঁকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়, সমষ্টিগত একতার বোধ থেকে তাঁকে শিথিল করার কৌশল শুরু হয়। স্বাধীনতা, সেজন্য, ঐ পরিস্থিতিতে লেখকের মানবিক হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপকরণ ; সেজন্যই, লোভে লোভে ক্লিন্ন মানবিক মূল্যবর্জিত অস্তিত্বের স্বার্থ স্বাধীনতা নয়। এই তফাৎই মানদণ্ড ; চিনিয়ে দেয় লেখকের সত্তা, তিনি স্বাধীনতার নিশেন কিংবা পরাধীনতার গবেষক।

স্বাধীনতার চেতনা লেখকের মধ্যে দুভাবে দেখা দেয়। সমস্যাবলীর সচেতন চর্চার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিক বিশ্বের স্ব-সম্পূর্ণ প্রক্ষেপণ তাঁকে স্বাধীনতার নিশেন বরদার করে তুলতে পারে, সেক্ষেত্রে তিনি একক মানব হিসেবেই যোদ্ধা, তিনি রক্ষা করতে উদ্যত তাঁর ব্যক্তিক বিশ্ব, তাঁর নিঃসঙ্গতা। আত্মচেতনার এই রূপ তাঁর কর্ম, তাঁর সাহিত্য সামাজিক মানসে বারেবারে ঘুরে ঘুরে দাবি করে। তিনি এবং তাঁর কর্ম তাঁর সাহিত্য শ্রেণী বিচ্ছিন্ন সমাজে ব্যক্তিস্বরূপ এবং কর্মের মূল্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনবরত যুদ্ধ করে চলে। স্বাধীনতার দিকে চৈতন্যের ঐ একক অভিযান চিন্তা, আবেগ ও সৃষ্টির বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কর্মের প্রতি লেখকের দায়িত্ব তৈরী করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে লেখকের যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঐ একক সচেতন চর্চা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে লেখক বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নিজকে মিলিয়ে দেন, ঐ প্রক্রিয়ার একটা অংশ তাঁর নিজেরই সত্তা, তখন তাঁর ঘোষণা : স্বাধীনতা কোন মিষ্টিক ব্রত নয় যে আত্মাভিমুখেই তার সিদ্ধি। স্বাধীনতার উৎস সমাজে ও সমাজের অনুভবে। লেখক যা-কিছু দেখেন,

জানেন, উপলব্ধি করেন সবই তাঁর সত্তার অঙ্গীভূত। ঐ দেখা ঐ জানা উপলব্ধির প্রভাবে তিনি পরিবর্তিত, সেজন্য তাঁর দেখা জানা উপলব্ধি কয়েদ করা যায় না, সেজন্যই তিনি বিবেক। যে-বস্তুনিষ্ঠায় লেখক নৈর্ব্যক্তিক মানবিক সমগ্রতা লাভ করেন, তারই প্রসাদে তিনি জীবনকে অবিচ্ছিন্ন সমগ্র রূপে দেখেন, তাই তাঁর স্বাধীনতা। সেজন্য জীবন তাঁর কাছে ময়দানে এক বক্তৃতা শোনা থেকে অন্য বক্তৃতা শোনা মাত্র নয় কিংবা এক নেতার বদলে অন্য নেতার গুণকীর্তন নয়, রক্তমাংসের জীবন চিবিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অভিজ্ঞতাকে তিনি ঘোষণা করেন বিদ্রোহের ভাষা দিয়ে, সেজন্য তিনি ষ্টাবলিসমেণ্টের শত্রু, তাঁর জেহাদ মানুষকে মানবিকতার ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য।

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা সবকিছুই সৃষ্টিশীলতা অবারিত করার জন্য। সৃষ্টিশীলতাবিরোধী উদ্যোগ শ্রেণীবিচ্ছিন্ন সমাজে কিংবা রেজিমেণ্টেড রাষ্ট্রে থাকে বলেই ব্যক্তি, সমাজ, স্বাধীনতা জখম হয়, ঐ জখম তৈরী করে প্রতিরোধ। লেখক প্রতিরোধে নিজেকে যুক্ত করেন তাঁর কর্মের মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নিজেকে মানবিকতার ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য। সমালোচনা তাঁর অস্ত্র, বিবেক তাঁর শিরস্ত্রাণ, মানুষের নিসর্গ সমাজ তাঁর বর্ম, লেখক এভাবেই সমগ্রতার ব্রতে অগ্রসর হন, বিচ্ছিন্নতার চেতনা তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে, আর বিচ্ছিন্নতা বিলোপ করার চেতনা তাঁকে বিপ্লবীতে রূপান্তরিত করে।

সেজন্য লেখকের হৃদয় থেকে স্বাধীনতা উঠে আসে। অর্থনীতির স্তর থেকে মানবিক স্তরে পেঁাছোবার জন্যই দরকার স্বাধীনতার, বিবেক হাতে করে সেদিকে যেতে হয় আর লেখকের নিজের বিবেকের চেয়ে মহত্তর সুন্দরতর যোগ্যতর আর কিছু নেই যা তিনি কালের হাতে তুলে দিতে পারেন। নিজের হৃদয়ে স্বাধীনতা যিনি প্রকাশ করতে ভয় পান তিনি কাপুরুষ, তিনি বিবেকহীন, আর বিবেক বিকিয়ে স্বাধীনতায় পেঁাছোন যায় না।

যে-সময়ের আমরা বাসিন্দা সেখানে লেখককে সমাজ, রাষ্ট্র, নেতা, সবাই খাঁচায় পুরতে চায়। কিন্তু লেখকের পটভূমি সকল মানুষ, মানবিকতার ছাঁচ, সেজন্য ঐ সবের আয়ত্তের মধ্য দিয়েই সম্ভব জীবনের রেঁনেশাস গড়ে তোলা।

১৯৭১-এ প্রচণ্ড ঘৃণার সময়ে লেখক হিসেবে নিজের বিবেক আমি পরিচ্ছন্ন রেখেছি, মানুষের নিসর্গে নিজেকে মিলিয়ে স্বাধীনতার শিখা জেলে রেখেছি, আগামীতে যতদিন বেঁচে থাকব বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। বিশ্বাসঘাতকতা আর স্বাধীনতার সহঅবস্থান হৃদয়ে সম্ভব নয়, যে-হৃদয়ে উৎসারিত স্বাধীনতার দীপ্ত শিখা, আর কি আমি উৎসারিত করতে পারি নিজের বিবেক ছাড়া বারে বারে দুঃসময়ে নিজের দেশে?

মধ্যবিত্ত, ভদ্রলোক এবং মূল্যবোধ

বাংলাদেশ গ্রামীণ সমাজ ; এই সমাজের ভিত্তি আবার অসমতা। এই অসমতার ভিত্তি ধনসম্পদ, ক্ষমতা এবং পদস্তর। সামাজিক অসমতার ভিত্তি কেবল ধনসম্পদ, ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা নয়, সেই সঙ্গে জড়িত মূল্যবোধের প্রশ্ন। এই অসমতার দুইদিক: বস্তুগত এবং মতাদর্শগত। এই দুইদিক পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট। জমি অবশ্য অসমতার সবচেয়ে বড়ো বস্তুগত দিক। অসমতা আবর্তিত জমির মালিকানা কেন্দ্র করে, তার সঙ্গে জড়িত অবসর, পদস্তর উপ-ভোগ এবং ক্ষমতা। কিন্তু সবসময়, সবক্ষেত্রে বস্তুগতদিকের সঙ্গে মতাদর্শগত দিকের মিল ঘটে না। জীবনযাপনের বাস্তবিক অসমতার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অসমতা। স্তরবিভক্তি গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য, এক্ষেত্রে পদস্তর মর্যাদাবোধ জীবনের সবদিকে প্রসারিত। জমির মালিক এবং ভূমিহীন চাষীর সম্পর্কের ভিত্তি সামাজিক অসমতা, তাকে মানুষী অবস্থা বলে স্বীকার করার ঝোঁকও বিদ্যমান। এই সমাজে শ্রেণী প্রত্যয় এভাবে দানা বেঁধেছে। এভাবেই বাংলা-দেশ সামাজিক স্তরবিভক্তি বৈধ করেছে এবং অসমতার মতাদর্শ তৈরী করেছে। ভদ্রলোকত্ব ঐ মতাদর্শ, এবং ভদ্রলোক ঐ মতাদর্শের ধারক, বাহক, প্রচারক। গ্রাম্যসমাজ ও ভদ্রসমাজের ফারাকের, বৈষম্যের একটি মাপকাঠি শিক্ষা। গ্রাম্যসমাজের মূল পেশা চাষবাস। ভদ্রসমাজের প্রধান পেশা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উদ্ভূত নানা চাকরি। তাই ভদ্রসমাজ শিক্ষিতসমাজ, আর শিক্ষিতসমাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণী-উদ্ভূত, আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজই।

কে কতটুকু জমির মালিক, জমি দিয়ে সে কি করে, কাকে নিয়ন্ত্রণ করে, কার সংস্থান যোগায় : এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ চাষবাসের সমাজে। কারণ এর সঙ্গে জড়িত ধনসম্পদ, ক্ষমতা এবং সুযোগসুবিধা। অর্থাৎ শ্রেণীবোধ। গ্রামীণ সমাজে তার ভিত্তি সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার থেকেই তৈরী

হয় স্বার্থের সংঘাত। পাটচাষের বহুল প্রসার এবং পাটের বাণিজ্যিক চাহিদা বাংলাদেশের মুসলমান মধ্যবিত্তের উদ্ভবের পিছনে কাজ করেছে। ১৯০৫ এর রুশ-জাপান যুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কোরিয়ার যুদ্ধ পর্যায়ে-পর্যায়ে মধ্যবিত্তের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছে ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। সেজন্য কলকাতা ও কলকাতা কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের বিকাশ এবং ঢাকা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের বিকাশ এক নয়। জমির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার কেন্দ্রিক সম্পর্ক আবার একই সঙ্গে সংঘাত এবং সংস্থিতি তৈরী করেছে। সেজন্য এই মধ্যবিত্তের উদ্ভব গ্রামীণ সমাজের পটে, মধ্যবিত্তের শ্রেণীবোধের ভিত্তি সম্পত্তি এবং পেশা, দুই-ই তার সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করেছে। সম্পত্তির বোধ তৈরী হয়েছে জমির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার থেকে, পেশার বোধ তৈরী হয়েছে শিক্ষার একচেটিয়া সুবিধা থেকে।

গ্রামীণ সমাজ-উদ্ভূত এই মধ্যবিত্তের পেশার উৎস : শিক্ষাজাত চাকরি। শিক্ষা তাই মাপকাঠি, শিক্ষা তাই মতাদর্শ, ভদ্রলোকের প্রত্যয়। আবার শিক্ষার কেন্দ্র নগর, ভদ্রলোকের বাসস্থান নগর। সমাজ গ্রাম ভেঙ্গেছে কিন্তু শিল্প বিপ্লব তৈরী করেনি। এভাবেই ভদ্রলোকের সমাজ সীমাবদ্ধ পৌরপ্রসার অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে। পৌরপ্রসারের অভিঘাত পড়েছে চাষবাসে, চাষবাসের সমাজ ঐতিহ্যবদ্ধ মূল্যবোধের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে, শিক্ষা উপস্থাপিত করেছে জীবনের পৌর নকশা, শিক্ষা নড়িয়ে দিয়েছে ঐতিহ্যবদ্ধস্তরসমূহ। শিক্ষা আছে, শিক্ষাকে শ্রদ্ধা করা হয়, কিন্তু কাজের,উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সরাসরি সম্পর্ক নেই, আবার শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সফলতা অর্জনের মাপকাঠি। এভাবে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে ভদ্রলোকের মতাদর্শ তৈরী হয়েছে, কাজ এবং উৎপাদন সম্বন্ধে ভদ্রলোকের মনোভাব দানা বেঁধেছে, গ্রাম ভেঙ্গে মধ্যবিত্ত এসেছে, সঙ্গে এসেছে গ্রামের অবসরভোগী সম্পত্তিবান শ্রেণীর জীবন-মনোভাব।

আবার বাংলাসমাজের মধ্যবিত্তের পটভূমি গ্রামীণ, সেইসঙ্গে ঔপনিবেশিক। গ্রাম্যতা এবং উপনিবেশের মানস আবহাওয়া তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রামীণ পটভূমি বলে পৌরপ্রসার ক্ষীণ, কিংবা হয়নি। বাংলাদেশের শহরে গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রবল। ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলতা, মোড়লীপনা, কোঁদল, সংকীর্ণতা তার বৈশিষ্ট্য। অন্যপক্ষে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি ছিল বলে চারিত্রিক ঋজুতার অভাব, চাটুকারিতা, লোভ সর্বক্ষেত্রে উচচারিত। আবার ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ছিল দুই পর্বায় : ইংরেজ আমল

এবং পাকিস্তানী আমল। দুই আমলে পাট চাষের প্রসার এবং পাটের বাণিজ্যিক চাহিদার দরুন শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। সেইসঙ্গে ইংরেজপ্রবর্তিত এবং পাকিস্তানে অনুসৃত পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির কাঠামোয় কাজ করার সুযোগ থাকার দরুন রাজনৈতিক ঐতিহ্যে এসেছে বক্তৃতার কলরোল। এই ঔপনিবেশিক সমাজ গ্রামীণ, এই সমাজের রুচি গ্রাম্য; আবার মধ্যবিত্ত গ্রামীণ সমাজ উদ্ভূত, এই মধ্যবিত্ত রুচিতে ফের গ্রাম্য, মনোভাবে গ্রামীণ; শিক্ষা আবার পদস্তর মর্যাদার প্রতীক, শিক্ষার একচেটিয়া সুযোগপ্রাপ্ত এই অংশের রাজনীতিতে বক্তৃতার বুলি এসেছে, রাজনৈতিক সুযোগের একচেটিয়া অধিকার থেকে মানসে তৈরী হয়েছে সম্পত্তির বোধ এবং পেশার বোধ, এক্ষেত্রে সম্পত্তি সারাদেশ, এক্ষেত্রে পেশা রাজনীতি এবং প্রশাসন। তাই রাজনীতির সুযোগ পেয়ে তারা দেশের মুরুব্বি বনেছে, অন্যপক্ষে প্রশাসনের সুযোগ পেয়ে চাকরি এবং মধ্যবিত্ততা সমান্তর ভেবেছে।

কিন্তু ঐ দুই ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাংলাদেশে উত্তরণের মধ্যে আবার মধ্যবিত্তের গ্রুপিংএ পরিবর্তন ঘটেছে। নাগরিকতার আংশিক প্রসার, আমলাতন্ত্রের বিকাশ এবং পরিবৃদ্ধি কলোনী-পর্বে মেট্রোপলিটান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ মধ্যবিত্তের শিক্ষিত শহরের অংশের মতাদর্শ ভদ্রলোকত্বের বোধ তীব্র, তীক্ষ্ণ করেছে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের দূরত্ব বেড়েছে গ্রামীণ সমাজ থেকে, শিক্ষিত ভদ্রলোক তার সীমাবদ্ধ রুচি নিয়ে জীবনযাপনের বিন্যাস তৈরী করার প্রয়াস করেছে। বিপরীতে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন মধ্যবিত্তের গ্রুপিংএর সেই অংশকে সামনে এনেছে যাদের পটভূমি গ্রামীণ, যাদের শিক্ষা স্বল্প, যারা দ্বিতীয় সারির ভদ্রলোক, যারা সুযোগ কম পেয়েছে। আসলে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন উৎপাদন সম্পর্ক বদলের আন্দোলন নয়, সেজন্য সুযোগ-সুবিধা, চাকরি,ব্যবসায়িক-লাইসেন্স, কণ্ট্রাকটারী ভিত্তি করে গ্রুপিংএ পরিবর্তন এসেছে। এভাবেই স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন মধ্যবিত্তের গ্রুপিংএ পরিবর্তন এনেছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের গ্রাম্যতা মেট্রোপলিটান সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বের বিপরীতে বাঙ্গালীয়ানার সমান্তর বলে বিবেচিত হয়েছে; কৃষি সমাজের ভদ্রলোকের রাজনীতির গ্রামীণ পটভূমি,মফস্বলী গন্ধ, শিক্ষার স্বল্পতা রুচির গ্রাম্যতা প্রকট করেছে। আবার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভারতে বসবাস তাদের চরিত্রের ওপর বিপুল প্রভাব ছড়িয়েছে। এভাবেই সীমাবদ্ধ ঔপনিবেশিক নাগরিক প্রসার পাশ কাটিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ফিরে গেছে। গ্রামীণ সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর

সাংস্কৃতিক ঝোঁক সামাজিক কারণেই গ্রাম্য, কারণ গ্রামীণ সমাজের অবসর ভোগী, সম্পত্তিবান স্তর থেকেই মধ্যবিত্তের উদ্ভব ঘটেছে। গ্রামীণ সমাজের রুচি মানবিক সম্বন্ধে, জীবনযাত্রায়, দেহস্বীকৃতির সহজতায়, পরম কৌতুকে স্পন্দমান। বিপরীতে কর্মবিমুখ, অবসরভোগী, সম্পত্তিবান স্তরের সাংস্কৃতিক রুচি গাজী মিঁয়ার বস্তানীর মতন, যার মধ্যে জনসভ্যতার প্রাণময়তার লক্ষণ অনুপস্থিত।

মূল্যবোধ সমাজের মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষ মূল্যবোধ গ্রামীণ সমাজের লক্ষণ, সার্বজনীন মূল্যবোধ পৌর সমাজের লক্ষণ। পৌর প্রসার বাংলাদেশে সীমিত, খণ্ডিত, সেজন্য সার্বজনীন মূল্যবোধ ব্যাপ্ত হয়নি। এই মূল্যবোধ জড়িত ব্যক্তির মেধা ও সিদ্ধির সঙ্গে। বিপরীতে বিশেষ মূল্য-বোধ জড়িত সামাজিক স্তরবিভেদ, ক্ষমতা, পদস্তর, সম্পত্তি, বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে। শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সীমাবদ্ধ পৌরপ্রসারের দরুন ঐ সার্বজনীন মূল্যবোধের আরাধনা ও বন্দনা করছেন। বিপরীতে গ্রাম্য সমাজ উদ্ভূত মূল্য-বোধ বিপর্যস্ত করছে তাদের জীবনযাত্রা। মূল্যবোধ যে-সব নিয়ে দানা বাঁধে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যতম। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তি গ্রাম্য বলে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত সুযোগ-সুবিধা, পদস্তর সংগ্রহ ও বণ্টন, ধনসম্পদ আহরণ ও অর্জন মধ্যবিত্তের দুই গ্রুপিংএ দুই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছে। ঐ প্রতিক্রিয়াই সংকট। মূল্য-বোধ শ্রেণী স্বার্থসংলগ্ন; শ্রেণীর মধ্যে মধ্যবিত্তের দুই গ্রুপিংএর টানা পোড়েন মূল্যবোধের সমস্যা তীব্র, তীক্ষ্ণ করেছে। বিভিন্ন গ্রুপিংএর বলীয়ান হয়ে ওঠা একপক্ষে ক্ষমতার নতুন বিন্যাস অন্যপক্ষে সুযোগ-সুবিধার নতুন বিন্যাস তৈরী করে। এ হচেছ দ্বন্দ্ব এবং আপস; দ্বন্দ্বের সঙ্গে মূল্যবোধ বদলে যায়, বিরোধ তীব্র হয়; আপসের সঙ্গে মূল্যবোধের চেহারার রকম ফের ঘটে, বিরোধের অবসান হয়।

এই গ্রামীণ সমাজ উদ্ভূত মধ্যবিত্তের অংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বরূপ কি? মোহভঙ্গ, বিরোধী মনোভাব, নৈরাশ্য, নাকসিটকানোপনা সবকিছুই তাদের চরিত্র, সেজন্য জীবন থেকে দূরে তাদের অবস্থান। আবার জীবনক্ষেত্রে আপেক্ষিক উন্নতি, বহু বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ, নতুন বিন্যাসের স্বীকৃতি: ঐ সবেরজন্য কিছু পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পাচেছও। জীবনবিরোধী মনোভাবের লুপ্ত হতে সময় নেয়, স্বাধীনতার আন্দোলন নানা স্বপ্নের জন্ম দেয়, সেজন্য ঐ আন্দোলন একটা বিষাদ রেখে যায় বাস্তব পরিস্থিতি স্বপ্নের সঙ্গে খাপ খায় না।

বলে। দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব শিক্ষিতদের জীবন বিচ্যুত করে চলে। অন্যান্য ব্যর্থতা ঐ বিচ্যুতিবোধ তীব্র করে তোলে। দেশের অর্থনীতি চাকরি চাকরির দিক থেকে শিক্ষিতদের অন্তরিত করতে ব্যর্থ হচেছ। পড়াশোনার পর চাকরির সরল নিশ্চয়তা নষ্ট হচেছ। শিক্ষিত সম্প্রদায় অবশ্য আদর্শ মানবদের সমষ্টি নয়। বিজ্ঞান ও গবেষণার সত্য, সাহিত্যিক ও শৈল্পিক প্রকাশক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা, গণজীবন ক্ষেত্রে সমাজবোধে তারা সম্পূর্ণ নিষিক্ত নয়। তাদের মধ্যে উচচারিত অহংকার, অ-দক্ষতা, আলস্য ; তাদের মধ্যে আছে স্বার্থপর আর চাটুকারের দল ; তাদের মধ্যেকার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সারির অনেকেই দক্ষতায় জং ধরিয়ে এনেছে বিশাল আত্মতৃপ্তি ও আত্মতুষ্টির বিনিময়ে। এই হচেছ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পটভূমি, তারা শিকার নিজেদের অভাববোধের, নিজেদের অসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণের, তাদের প্রতিকূল প্রতিবেশের। তারা বুদ্ধিবন্দী এবং পেশাগত প্রতিষ্ঠানাবলীর অপ্রতুল পরিবৃদ্ধি, নগরজীবনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক একপেশে কিংবা নগরজীবনের তারা নষ্টের শিকার। দেশের মোট জনসমষ্টির তুলনায় তারা সংখ্যায় নগণ্য, সেজন্য বুদ্ধির দিক থেকে অভাবী প্রতিবেশে তাদের কেন্দ্র করে উৎসাহ উদ্দীপনা দানা বাঁধছে না।

যে-সমাজ তৈরী হচেছ সেক্ষেত্রে শিক্ষিতদের ভূমিকা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষিতদের মতামত গণজীবন থেকে দূরে সরে যাচেছ, অন্যপক্ষে বহুবিধ চাপের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অংশ অবাস্তব বিচ্যুতিতে ভুগছে। সাংবাদিকরা কুৎসা কেলেঙ্কারী ফাঁশ এবং ক্ষমতার কাছে বিনতির দোটানায় ভুগছে। সরকারী কর্মচারীরা সতর্কভাবে পা ফেলছে এবং ঠোঁট বন্ধ করে রোজগার করছে। ঐ সব কারণে শিক্ষিতদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রিয়াশীল অনৈক্যের শক্তি, সবাই নিজেদের মধ্যে বদ্ধ। তারপর আছে আমেরিকা-ফেরতা আর বিলেত-ফেরতা আর মস্কো-ফেরতা আর দিল্লী-ফেরতা, যারা গেছে আর যারা কখনো যায়নি তাদের মধ্যেকার বিভিন্নতা, সেইসঙ্গে আছে তাদের মধ্যেকার পদস্তর বিভিন্নতা এবং পদস্তর সংগ্রহের সংগ্রাম। আরো আছে বিশেষ দক্ষতার পার্থক্য, মানবিক এবং ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী শাস্ত্রে শিক্ষিতদের মধ্যে পার্থক্য।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজনীতিবিদ্‌দের সম্পর্ক কি? শিক্ষিত সম্প্রদায় বক্তা-রাজনীতিবিদ্‌দের বিরোধিতা করতে অনিচ্ছুক, তার আংশিক কারণ বিচক্ষণতা, আংশিক কারণ শারীরিক এবং অর্থনৈতিক দুদিক থেকেই চামড়া বাঁচানোর দায়। যেক্ষেত্রে তারা রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে

সেক্ষেত্রেও বিরোধিতা করতে অনিচ্ছুক, তার কারণ রাজনীতিবিদ্‌রা নিজেদের জাতিক অস্তিত্ব এবং ঔপনিবেশিক সংগ্রামের প্রতীক বানিয়ে তুলেছে, ঐ জাতিক অস্তিত্ব এবং ঔপনিবেশিকবিরোধী লড়াইয়ের দরুন শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবনা ও কর্মে সতর্ক : পাছে যদি ভুল বোঝা হয়। গরীব দেশে সৎ চরিত্রবান বুদ্ধিজীবী কিংবা নেহাতই চরিত্রসম্পন্ন শিক্ষিত হওয়া দুরূহ বলে অনেকেই সময়ের ক্রীতদাস, অনেকেই শামুকের মতন আত্মগোপনকারী।

রাজনীতিবিদ্‌রা বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি তৈরী করেছেন এবং কায়মনোবাক্যে তার প্রসার করেছেন। বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতির পটে আছে তিনটি উপাদান: গ্রামীণ সমাজ, ঔপনিবেশিক আমল এবং পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি। গ্রামীণ সমাজের অবসরভোগী অংশ থেকে বেড়ে উঠেছেন রাজনীতিকরা, ঔপনিবেশিক আমলে দায়িত্ববোধ প্রমাণ দরকার ছিল না বলে তাঁরা কথা নিয়ে খেলেছেন, আর পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের গ্রাম্যতা এবং দায়িত্বহীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে সমাজক্ষেত্রে কর্মের বদলে এসেছে বক্তৃতার বোধ, উৎসারিত হয়েছে দায়িত্বের বদলে মুরুব্বিয়ানার বোধ, নিরীক্ষার বদলে দেখা দিয়েছে অহমিকার বোধ। এভাবে পার্লামেণ্টারী রাজনীতি জীবন থেকে দূরে সরে গেছে, সমাজের সঙ্গে ভদ্রলোকের রাজনীতির বিচ্যুতি ঘটেছে, শিক্ষিত অংশের সঙ্গে রাজনীতির বিচ্ছেদ ঘটেছে। বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতির সওগাত: বুলি, লোকঠকানো, কর্মবিহীন তুষ্টি, সময়হত্যা। অবশ্য বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি ভদ্রলোকের সংস্কৃতির উল্টো পিঠ, সমাজে ঐ সব উপাদান প্রবল হলে ভদ্রলোকের এক অংশ বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা শুরু করেন, ভদ্রলোকের সংস্কৃতির অপরিণত দিকই রাজনীতিকদের বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি।

এ থেকে বাঁচবার পথ কি? মানববাদী এবং বৈজ্ঞানিক কারিগরী সংস্কৃতির মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাস করে আনা কিংবা বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি অস্বীকার করা অথবা ভদ্রলোকের সংস্কৃতির পাশ কেটে চলার মধ্যে নিদান নয়। ভিন্নতর সংস্কৃতি সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিহিত বলে মনে হয়। ঐ সংস্কৃতিতে অন্তরিত থাকবে গভীরতর গণজীবনবোধ, আত্মবোধ একই সঙ্গে যা সামাজিক আত্মবোধ, ব্যক্তিক আত্মবোধ নয়। মানববাদী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সংস্কৃতির সমীকরণ কেবল নয়, তারও অধিক, পেশাগত এবং সামাজিক সংস্কৃতির সমীকরণ। পেশাগত সংস্কৃতি সমাজের বহুত্ববাদী রূপান্তরণের জন্য জরুরী, বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি নষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয়, সামাজিক সংস্কৃতি

রাজনীতিবিদ্‌দের বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি / ভদ্রলোকদের সংস্কৃতির বিপরীতে ভিন্ন ভিত্তি, ভূমি, কেন্দ্র তৈরীর জন্য আবশ্যিক, কোন একটিও সমাজ রূপান্তরণে যথেষ্ট নয়।

বর্তমানে সামাজিক সংস্কৃতি বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি/ভদ্রলোকের সংস্কৃতির বিপরীতে শক্তিশালী নয়। কারণ হচ্ছে বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতির কেন্দ্রে যারা আছে তাদের হাতে অর্থের পুতুল নাচের সুতো, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিবেক-বোধের ওপর তাদের প্রভাব অপরিসীম ; অন্যপক্ষে ভদ্রলোকের সংস্কৃতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবর্তিত। এও সত্য বিভিন্ন চাপের দরুন, বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতির দরুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অংশের পেশাগত ক্ষেত্রে নিজেদের গুটিয়ে আনার প্রবণতা ; অন্যপক্ষে পেশাগত ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের সংস্কৃতি চর্চার দরুন সংস্কৃতির সংকোচন। অবশ্য, অন্য অর্থে, পেশাগত ক্ষেত্রের নির্মাণ, পেশাগত সম্প্রদায়/উপসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা সামাজিক সংস্কৃতি তৈরীর ক্ষেত্রে সহায়ক। সমাজে বিকল্প যুক্ততার বোধ সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়ে সামাজিক সংস্কৃতি তৈরী হয়ে চলে এবং বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি/ভদ্রলোকের সংস্কৃতির বিকল্প যুগিয়ে চলে। নিয়ত সমাজে মানুষে যুক্ততার বোধ সৃষ্টিশীল। বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি ঐ যুক্ততার বোধ তৈরী করতে অক্ষম আর ভদ্রলোকের সংস্কৃতিতে ঐ যুক্ততার বোধ খণ্ডিত। বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি নিয়ত প্রতিপক্ষ চিন্তা করে : ঘৃণা, আক্রোশ, হিংসা তার হাতিয়ার ; ভদ্রলোকের সংস্কৃতি নিয়ত স্তরবিভক্তি চিন্তা করে: অশিক্ষিত, মূর্খ অশালীন তার চিন্তার সোপান। অন্যপক্ষে বক্তৃতা-ভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিবাদী উপকরণ থাকে না বলে মতাদর্শে পরিণত হয় না, আবার ভদ্রলোকের সংস্কৃতি সমাজে খণ্ডিত বলে সীমাবদ্ধ চর্চায় বিলাসে পর্যবসিত হয়।

ভদ্রলোকের সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ, বক্তৃতাভিত্তিক সংস্কৃতি অপরিণত, এই দুই আসলে একই সংস্কৃতি, চাঁদের পিঠের মতন, সেজন্য এই সংস্কৃতির চর্চা বৃহত্তর সমাজকে অন্তরাল করে আর মানুষকে করে তোলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, মানুষের অখণ্ডতাবোধ নষ্ট করে। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ সৃষ্টিশীল, আবার মানুষের সঙ্গে নিসর্গের, নিসর্গের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ সৃষ্টিশীল: সংস্কৃতি তার আধার, বিভিন্নের মধ্যেকার বিনিময়, আর সংস্কৃতি চর্চার উপার্জন এই অখণ্ডতাবোধ ; বাংলাসমাজকে উত্তীর্ণ করাতে হবে এই লক্ষ্যে। সেজন্য সংস্কৃতি নিরন্তর সচেতন চর্চা, অবিরাম পরিকল্পিত পদক্ষেপ, জীবনযাপনের স্থায়ী উপায়। বেঁচে থাকবার জন্য এই মূল্যবোধই দরকার।

ঢাকা শহর ও নগর পরিকল্পনা

আমার ভাবনা : ঢাকা জীবন্ত শহর হোক, মানুষ ভিড়ের মধ্যে মর্যাদা নিয়ে ঘুরে বেড়াক। জীবন্ত শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে আমি একজন; কিংবা ভিড়ের মধ্যে মর্যাদায় সমুন্নত আমি : এই ভাবনা আমাকে উদ্দীপিত করে তোলে। শহরের পটভূমি দেশের বাস্তবতাই, আর মানুষকেই গড়ে তুলতে হয় শহরের বাস্তবতা। সেজন্য ঢাকার অতীত সম্বন্ধে আমার মমত্ব প্রবল, সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার উৎসাহ অন্তহীন। শহর তো সম্পর্কের সমাহার, মানুষের সঙ্গে নিসর্গের, মানুষের সঙ্গে ভিড়ের, ভিড়ের সঙ্গে রাস্তার, রাস্তার সঙ্গে বাড়িঘরের; সবটাই শহরকে শোধন ও স্থিতিশীল করে তোলে, শহরের সমাজে সম্পর্কের বিভিন্ন ঝোঁককে সুষম পরিসরে অর্থবহ করে তোলে। মানুষেরা, বাসিন্দারা শহরে বেড়ে চলে জীবনে বেঁচে থাকার জন্যই। সেই বেঁচে থাকা সমাজে, নিসর্গে, রাস্তায়, বাড়িঘরে মিলিয়ে দেয়াই নগরপরিকল্পনা, তা না হলে নগরপরিকল্পনা কেন?

কিন্তু ঢাকা, আমার ঢাকা শহর মরে যাচ্ছে। কারণ পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন। সেজন্য সময় এসেছে পরিকল্পনা ও পুনর্গঠনের নীতি ও লক্ষ্য আলোচনা করার। শুরু করা সম্ভব খুবই সাধারণ বিষয় নিয়ে : কোন্ ধরনের রাস্তা নিরাপদ, আর কোন ধরনের নয়; কেন কতক বস্তি শেষ পর্যন্ত বস্তি থেকে যায়, কেন পার্ক পতন ও পাপের চক্র।

পরিকল্পনাবিশারদদের মধ্যে দারুণ একটা মিল আছে। সে হচ্ছে যদি অজস্র অর্থ খরচ করা যেত তাহলে বস্তি বদলে দেয়া যেত, গতকাল যেসব বস্তি এলাকা ছিল সেসবের কুশ্রীতা রোধ করা যেত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক-জনদের যত্রতত্র গাছের মতন রোপণ করা যেত, এমনকি ট্রাফিক সমস্যার ও সুরাহা করা যেত।

দেখা যাক তাঁরা কি তৈরী করেছেন : স্বল্প-আয় বাসস্থান প্রকল্প (কমলাপুর, মীরপুর) বদমাসদের আড্ডাখানায় পরিণত। মধ্য-আয় বাসস্থান প্রকল্প

(আজিমপুর, ঝিকাটোলা, বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার) ধূসর, একঘেয়ে আর একরঙ্গা। ব্যয়-বহুল বাসস্থান প্রকল্প (গুলশান, ধানমণ্ডী) রুচি-হীনতা ও স্থূলতার মনুমেন্ট। শহরে কোন সিভিক সেন্টার নেই। কোন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নেই। বাণিজ্য এলাকাগুলো ধনতন্ত্রী পশ্চিমের জৌলুষহীন অনুকরণ। শহরের এ পুনর্গঠন নয়, শহরের হৃদয়ে ছুরি বেঁধানো হচ্ছে। অমন আশ্চর্য তামাশা সার্থক করার জন্য বহু লোককে হটানো হয়েছে, উন্মূল করা হয়েছে; স্বল্পবিত্তের হাজার হাজার লোককে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। প্রায় পুরো শহরটা তরমুজের মতন টুকরো টুকরো করে তেজারতীতে খাটান হয়েছে, বদলে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে হতাশা আর ক্ষুব্ধতা। মানুষ হয়ে উঠেছে খাঁচায়পোরা জীব, তাদের জীবন করে তোলা হয়েছে একঘেয়ে, বন্ধ্যা আর স্থূল; আর তাদের যাঁরা কর্তা তাঁরা সরকারী যন্ত্র ব্যবহার করে শহরবাসীদেব সওগাত দিয়েছেন নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমী, অপার বন্ধ্যাত্ব আর নিরেট স্থূলতা।

হয়তো আমার উক্তি কড়া হয়ে যাচ্ছে গোঁড়া নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে। ভুলে যত যেতেই চাই সম্ভব নয়, কারণ ঐসব গোঁড়া তত্ত্ব আমাদের জীবনের অংশ; বেপে রাস্তা, বিশ্রী বাড়িঘর, গরু-বাছুরওয়ালা-হঠাৎ-প্রাসাদ সবই ঐসব তত্ত্বেব ফলশ্রুতি। তত্ত্ব আমাদের জীবন জখম করছে, আমাদের মানস ক্ষতি করছে, কারণ আমরা তত্ত্ব মেনে নিচ্ছি, মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি বলে। নগরপরিকল্পনার কর্তাদের ভাবনা এমত: শহরের সমস্যার সুরাহা হচ্ছে সবকিছুকে প্রয়োজনের ছাঁচে ফেলা এবং সকল এলাকাকে স্ব-বদ্ধতার খাঁচায় সাজিয়ে তোলা। ধরা যাক বাসস্থান সমস্যা। বাসস্থানকে তাঁরা ছোট শহরের সামাজিকতার ভিত্তিতে বিচার করে থাকেন। বাণিজ্য তাঁদের কাছে ছককাটা, মালামাল সরবরাহ ব্যবস্থা, স্ব-বদ্ধ বাজারের জোগানদার হিসেবে। উত্তম পরিকল্পনা তাঁদের কাছে একসাব স্থানু কর্ম মাত্র। মেট্রোপলিসের বহুমুখী, জটিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন তাঁদের কাছে বাতিল। আমলা-তান্ত্রিক চিন্তার বিপরীতে আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদদের পরিকল্পনার ভিত্তি সমগ্র অঞ্চল। তাঁদের মত: শহরকে বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে কৃষি ও বনজ এলাকার বিপরীতে সুষমতার ভিত্তিতে। তাঁদের কাছে প্রতিবেশ হিসেবে মানুষের জন্য রাস্তা খারাপ, তাই বাড়ির মুখ গাছপালা ও সবুজের দিকে ফিরিয়ে নেয়া দরকার রাস্তা থেকে। নগর নক্সার মূল ইউনিট রাস্তা নয়, ব্লক। বাণিজ্য আলাদা আবাসিক এলাকা থেকে। বহুলোকের উপস্থিতি মন-খারাপ-করা অবস্থা, সেজন্য তাঁদের ভাবনার লক্ষ্য: বিচ্ছিন্নতা ও ব্যক্তি-

কতার অন্তত এক মায়াভাস তৈরী করা। তাঁরা ঢাকা শহরকে বিকেন্দ্রিক করতে চান, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় জনসমষ্টিকে ছড়িয়ে দিতে চান; গুলশান, বারিধারা, বনানী, সাভার বিশ্ববিদ্যালয় তার নজির।

আমলা এবং পরিকল্পনা বিশারদ, দুপক্ষই, বাসস্থানের ঘনত্বের সঙ্গে বাসস্থানের ভিড় গুলিয়ে ফেলেছেন। অতি ঘনত্বের অর্থ হচ্ছে প্রতি একর জমিতে বহুসংখ্যক ঘরবাড়ি। অতি ভিড়ত্বের অর্থ হচেছ কোন একটি বাসগৃহে কামরার হিসেবে অসংখ্য লোক। শহরে জমির অভাব, কিন্তু প্রতি একর জমিতে কমসংখ্যক ঘরবাড়ি তুলবার ব্যবস্থা করে তাঁরা অতি ভিড়ত্বের জন্ম দিচেছন অনবরত। সেজন্য ঘনত্বের বিপরীতে ভিড়ত্বের পরিমাণে ঢাকা শহরের বাসগৃহের সমস্যা ভাবতে হবে। কিন্তু আমলা এবং পরিকল্পনা-বিশারদের ভাবনার কেন্দ্র হচেছ: মেট্রোপলিটান এলাকায় লোকদের কি করে ঠেকানো যায়। লোক নয়, আর লোক নয়, শহরবাসের তারা যোগ্য নয়।

সে জন্য তাঁরা মেট্রোপলিটান ঢাকা জুড়ে নতুন, কিছুসংখ্যক স্ব-নির্ভরশীল শহর তৈরীর প্রয়াস করেছেন। মেট্রোপলিটান এলাকায় বহুসংখ্যক ছড়ানো ছিটানো যায়গা রয়েছে, যেগুলো এক সময় আপেক্ষিকভাবে স্বনির্ভরশীল ছিল (রায়ের বাজার, মীরপুর, যাত্রাবাড়ি, কমলাপুর)। যে দিন থেকে ঐসব এলাকাকে মেট্রোপলিটান ঢাকার জটিল অর্থনীতির মধ্যে টেনে আনা হয়েছে তাদের যায়গা, আমোদ-প্রমোদ, বেড়ানো, হাট-বাজার, কেনা-কাটার বহুতর বাছাই নিয়ে, সেদিন থেকেই তারা হারাতে শুরু করেছে তাদের নিজস্বতা, তাদের আপেক্ষিক সম্পূর্ণতা, সামাজিক, আর্থনীতিক সাংস্কৃতিক অর্থে। দুদিক আমরা পেতে পারি না। বিংশ শতাব্দীর মেট্রোপ-লিটান অর্থনীতি সেই সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বিচ্ছিন্ন শহুরে জীবন।

এর পিছনের চিন্তা হচেছ: ক্ষুদ্রসংখ্যক মানুষ নয়নসুখকর এবং অধিক সংখ্যক মানুষ নয়নে বিরক্ত উদ্রেককারী। সে জন্যই অর্থ/ক্রয়ক্ষমতা/পদস্তর ভিত্তি করে মানুষদের বসত বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন, সংকীর্ণ করা। সেজন্যই মনুষ্য নামক বিভ্রান্তি উৎপাদনকারী জীবদের শ্রেণীবদ্ধ ও তালিকাবদ্ধ করে চুপচাপ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া। মডেল নগর প্রকল্প এই ভাবনারই ফলশ্রুতি। সেজন্যই ভিন্নমত হাজির করার সময় এসেছে। শহরে মানুষের জটলা ও ঘনত্ব ভালো মনে করা জরুরী। মানুষ তাজা বিশাল প্রাণাবেগের উৎস, ক্ষুদ্র ভৌগোলিক খণ্ডে তারা বিভিন্ন ও সম্ভাবনার অনিঃশেষ ঐশ্বর্যের প্রতিভূ।

যদি এই মত মেনে নেয়া যায় তাহলে বলতে হয় মানুষের স্বীকৃতি দরকার সম্পদ হিসেবে আর তাদের উপস্থিতির দরকার আনুষ্ঠানিক উৎসব হিসেবে, ঐ দুই কারণে দরকার জীবন্ত দৃশ্যমান রাস্তার গণজীবনের। পরিকল্পনাবিশারদগণ আর আমলাতন্ত্রের প্রভুরা শহরে মানুষের বসতকে আকাঙ্ক্ষিত উৎসব বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন, আর সেজন্যই বানিয়েছেন সচ্ছল নাগরিকদের জন্য শহরে বাগানবাড়ির পরিকল্পনা শহরের পরিবৃদ্ধি পঙ্গু করে, শহরের হৃদয়ে ছোরা বসিয়ে, আর বাগানবাড়ির মালিকদের সেবাদাস হিসেবে শহরের চারকোণায় বস্তি আর নিম্নবিত্তদের বসত নির্ধারিত করে। ঢাকা এখন আর নয় মানুষের শহর, পরিকল্পিতভাবে তৈরী বস্তি আর প্রামাদের শহর।

সেজন্য ঢাকা শহরে বেড়ে যাচেছ মাত্রাছাড়া ক্লেদ, হতাশা, ধর্ষণ, খুন ও আত্মহত্যার নৈরাজ্য। সেইসঙ্গে ঢাকা শহর প্রতি মুহূর্তে ঘা দিয়ে মানুষকে সচেতন রাখছে, তার মধ্যে জাগিয়ে দিচেছ রক্তাক্ত হবার সাধ। তাই মানবিক অস্তিত্বের মূল্য তাকে করে তুলছে টালমাটাল, সে চালাচেছ নিরবচিছন্নভাবে দ্বিমুখী আন্দোলন। একদিকে, জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ও রক্তাক্ত আর্তনাদের মধ্যে বেঁচে থেকে সে প্রমাণ করছে ঢাকার প্রাসাদবিলাস মানবিক নয়। অন্যদিকে, গোটা শহরটার কাঠামো ফাটিয়ে দিয়ে সে টেনে আনছে আদত মানুষটাকে। সেই আদত মানুষটাকে মেলাতে হবে শহরটার মধ্যে আর শহরটাকে মেলাতে হবে গোটা সমাজটার মধ্যে। আর গোটা সমাজটার বাসিন্দা হবে সম্পূর্ণ মানুষ।